– তৃতীয় অধ্যায় –

প্রত্নকথার বিনির্মাণ ও বিকল্প আধুনিকতার সৃজন ঃ নির্বাচিত উপন্যাসের নিবিড় পাঠ– ‘রহু চণ্ডালের হাড়’, ‘দেবাংশী’, ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’, ‘রাজপাট-ধর্মপাট’।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রত্নকথার বিনির্মাণ ও বিকল্প আধুনিকতার সৃজন ঃ নির্বাচিত উপন্যাসের নিবিড় পাঠ– 'রহু চণ্ডালের হাড়', 'দেবাংশী', 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর', 'রাজপাট-ধর্মপাট'।

এই অধ্যায়ে আমরা অভিজিৎ সেনের কথনবিশ্বের একটি বিশেষ প্রবণতার মূল্যায়নের চেষ্টা করব। প্রত্নকথার বিনির্মাণ ও বিকল্প আধুনিকতা– বিষয়দুটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। বিনির্মাণ বা deconstruction বলতে বোঝায় কোনো একটি সৃষ্টিকে ভাঙা। অভিজিতের আখ্যানে এই ভাঙনের প্রক্রিয়া ঘটেছে পুরাকথার প্রসঙ্গে। ডিকনস্ট্রাকশনের তত্ত্ব শুধু ভাঙনের নৈরাজ্য নয়, ভেঙে আবার গড়া। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় যুগোপযোগী তাৎপর্যে অভিষিক্ত করা, নতুন অর্থের নিষ্কাশন। যে কোনো সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এই ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েই। মধুসূদন কলোনি শাসনের প্রেক্ষিতে রামায়ণকে ভেঙে নতুন করে গড়েছেন। তাঁর বিনির্মাণে রাবণ ও মেঘনাদ দেশপ্রেমিক বীর হিসাবে প্রতিভাত। এই বিনির্মাণই আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির কাছে বাল্মীকির প্রাচীন কাব্যটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। এই বিনির্মাণই আমাদের জাতীয়তাবাদী আবেগের প্রাথমিক স্ফূরণ ও বিকাশের সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নব হিন্দুবাদী ভাবনা বাংলা নাট্যসাহিত্যে রাজপুত-মোঘল সংঘাতের ইতিহাসের আরেক বিনির্মাণের প্রেরণার উৎস হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সত্তর পরবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যে লোকসংস্কৃতি-মিথ- পুরাণ-উপকথা-পুরাকথার এক নতুন ধরনের বিনির্মাণপন্থী প্রয়োগ চোখে পড়ে। একে 'বিকল্প আধুনিকতা' বলছি আমরা। তবে প্রশ্ন হলো এই আধুনিক যুগের যুক্তিমনা প্রাগাধুনিক ব্যক্তিসর্বস্বতায় পুরাকথাকে বাঁচিয়ে রাখার উৎসাহ কেন? উত্তর সম্ভবত এই যে, তথাকথিত যুক্তিনির্ভর ব্যক্তিনির্ভর যে

যুগ– যাকে আমরা সগর্বে আধুনিক বলে আখ্যায়িত করছি সেখানে প্রকৃত আধুনিকতা আসেনি, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও। ইউরোপের ভিন্ন আর্থ রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে গড়ে উঠা চিন্তাকাঠামো মডেল হিসেবে সামনে রেখে কয়েকটি বানানো উপাদানকে বারে বারে আওড়ানোর নামই আমরা দিয়েছি 'আধুনিকতা'। বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা আধুনিক উপন্যাসের ধারাটি নির্মিত হয়েছে সমস্ত দেশজ উপাদানকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্য আশ্রিত একটি মডেলকে অনুকরণ করে। কিন্তু তাই বলে এই অনুকৃত উপন্যাস নির্মাণের পূর্বে যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নির্মাণযোগ্য উপকরণ বিদ্যমান ছিল না– এমন নয়। কিন্তু দেবেশ রায়ের ভাষায় –

"প্রাক্ আধুনিক বাংলার আখ্যান সাহিত্যে যদি আমরা উপন্যাসের বিবরণ আবিস্কার করতে পারি ও পাঠ করতে পারি তাহলে সে বিবরণ বাংলা উপন্যাসের এমন এক প্রাগিতিহাস যা থেকে উপন্যাসের কোন ইতিহাস তৈরি হয় নি।'' [১]

অর্থাৎ আধুনিক উপন্যাস হিসেবে সেই কথাসাহিত্যের ধারাটিই স্বীকৃতি পেয়েছে যার ইতিহাস রয়েছে পাশ্চাত্য নভেলের অনুকরণের প্রক্রিয়ায়। এই তথাকথিত আধুনিক উপন্যাসের নির্মাণ হয়েছে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমের সাজানো জীবনকে আধেয় করে। আর এই নির্মাণই লাভ করেছে 'মেইনস্ট্রীম' বা মূলানুগ সাহিত্যের মর্যাদা। কিন্তু এই মর্যাদাপ্রাপ্ত সাহিত্যধারায় সম্পূর্ণতা আসেনি, কেননা এতে সমাজের একটা বিরাট অংশ বাদ পড়ে গেছে। এই বৃহৎ অংশটি হলো সাধারণ মানুষ। এই বৃহৎ অংশটিকেই আধেয় হিসেবে গ্রহণ করে সম্ভবত নিজেদের লেখক হিসেবে বর্তানো দায়িত্ব পালন তথা কলমশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সত্তরের দশকের একঝাঁক লেখক সাহিত্যের মূল ধারাটির প্রবাহের দিক পরিবর্তনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। উত্তর- আধুনিকতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা অভিনব গুপ্ত বলেছিলেন–

"নভেল নামক মডেলটিকে পরিত্যাগ করবার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু মডেলটি

পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।'' [২]

এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যেই হয়তো এই লেখকবর্গ পুরাকথার ভাঁজ খোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। কেননা তাদের উদ্দেশ্য দেশজ ইতিহাসকে পুনরাবিস্কার, প্রতীচ্যের আরেকটি নতুন অনুকরণ নয়।

তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যের মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত কেন্দ্রিক ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে গ্রামভিত্তিক, গোষ্ঠী ভিত্তিক আখ্যান রচনার যে প্রয়াস বিশ-শতকের শেষের তিন দশকের কিছু লেখকদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম কথাকার হলেন অভিজিৎ সেন। তাঁদের এই প্রয়াসকে যদি আমরা 'বিকল্প আধুনিকতা'র আখ্যায় আখ্যায়িত করি, তবে এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকতে দেখি প্রত্নকথা-লোককথা-মিথ-কিংবদন্তী-লোকবিশ্বাসের এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থিকে। আধুনিকতার এই নতুন ধরনের প্রস্তাবনার কথা লেখক অভিজিৎ নিজেও উল্লেখ করেছেন তাঁর বিভিন্ন বয়ানে। লোকজীবনের আচার, ব্যবহার, সংস্কার– এগুলির পুনঃপাঠ এবং সামাজিক তাৎপর্যের সন্ধান আধুনিক আখ্যান লেখকের 'জরুরী দায়' বলে মনে করেন কথাকার। লেখকের সমকালীন ভগীরথ মিশ্র, মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় ও এই প্রকরণটির সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। মহাশ্বেতা দেবী তো লোকবৃত্তেই জনজীবনের ইতিহাস সন্ধান করেছেন। সাম্প্রতিক অতীতে সাবলটার্নবাদী বীক্ষায়ও লোকসংস্কৃতির পরিসরে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের এই তৃতীয় অধ্যায়ের অভিজিৎ সেনের নির্বাচিত চারটি উপন্যাস 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর', 'রহুচণ্ডালের হাড়', 'দেবাংশী' এবং 'রাজপাট-ধর্মপাট'কে লোক উপাদান ও বিকল্প আধুনিকতার প্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছি।

মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, গীতিকা ইত্যাদিতে বাঙালির দেশজ ইতিহাসের যে উপাদান রয়েছে, ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাহিত্যিকদের কাছে সেই উপাদানসমূহ সাহিত্যের বিষয় হবার যোগ্যতা পেলো না। মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, গীতিকার আখ্যানে

সাধারণ মানুষই ছিল প্রধান আধেয়, কিন্তু ঔপনিবেশিক আখ্যান সাহিত্যে সাধারণ মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, হাসি, কান্না-একেবারেই অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলো। ঔপনিবেশিক প্রভুরা ঘোষণা করলেন– বাঙালির কোনো ইতিহাস নেই, আর বাঙালিও তাদের এই মতকে সম্মতি জানালো বেশ গর্বিত ভাবেই। আর সেই সাথে তারা মন দিল পাশ্চাত্য মডেলের অনুকরণে ইতিহাস প্রণয়নে। আর এই প্রক্রিয়ায় হারিয়ে গেল আমাদের দেশজ ইতিহাস, দেশজ ঐতিহ্য, দেশের মানুষ। কিন্তু সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের নির্মাণ– এ তো মিথ্যা নির্মাণ। আর তাই এই মিথ্যা নির্মাণকে ভেঙে অর্থাৎ বিনির্মাণ ঘটিয়ে লোককথা, মিথ, কিংবদন্তীকে আবার আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন অভিজিৎ সেনের মত সাহিত্যিকেরা। লেখক তাই বলছেন –

"লোককথা, লোকসঙ্গীত এবং লোকশিল্পের সেই অবাধ শৈলী আমি আত্মস্থ করতে চাই যা দিয়ে পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত সবাইকেই মুগ্ধ, বিস্মিত, এবং প্লাবিত করা যায়।.... আধুনিক বাস্তবতার যত রকম রূপ আছে, তার সবকটির মধ্যেই গলাটিপে শ্বাসবন্ধ করে সুস্থ জীবনবোধকে ধ্বংস করার প্রবণতা আছে বলে অনেকের মত আমারও মনে হয়।... সুস্থ জীবনবোধ জাগ্রত করার জন্য মঙ্গলকাব্যের বাস্তবতা কিংবা লোককথার বাস্তবতাকে নতুন যুগোপযোগী করে নিয়ে আসাতেই আমার এবং আমার মত আরো অনেকেরই লক্ষ্য থাকবে।'' [৩]

লোককথার বাস্তবতাকে নতুন যুগোপযোগী করতে চান লেখক, তাই লোককথা, পুরাণের আখ্যান বিনির্মিত হয় তাঁর হাতে।

লেখক স্বীকার করেছেন যে তিনি পূর্বতন কথাসাহিত্যের ছক থেকে বেরিয়ে এসেছেন। উপন্যাস, ছোটগল্পের বিষয় কি হবে, কি হওয়া উচিৎ, এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেছেন –

"সেখানে লোক-জীবনের অবস্থান, লোককথা, লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস, লৌকিক আচার, অবিচার, সংস্কার ইত্যাদির অভিজ্ঞতার উপাদান যার অধিক থাকবে এবং

এসবকে যথার্থ বুঝবার ও ব্যাখ্যা করবার স্পর্ধা যার থাকবে, সে আর অন্যত্র উপাদান অনুসন্ধানে যাবে কেন?'' [৪]

এই 'স্পর্ধা' অভিজিৎ সেন দেখিয়েছিলেন সাধারণ লোকজীবন, জনজীবনকে বৃহত্তর সমাজের সামনে তুলে ধরে, যার অন্যতম উদাহরণ লেখকের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাস।

'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসটির আলোচনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই উপন্যাসটি যেমন বিষয়গত দিক থেকে লেখকের অন্যান্য রচনা থেকে আলাদা, তেমনি এর চলার গতিও এগিয়েছে এক নতুন পথ ধরে। এই উপন্যাসে লেখক তাঁর মনোযোগকে সংহত করেছেন সমাজ ব্যবস্থার আধিভিত্তিস্বরূপ গৃহীত পৌরসমাজের আখ্যানে।

"সামাজিক অচলায়তনে যৌবনের উদ্দাম ভালোবাসা যখন অন্তর্ঘাত করে, গ্রামীণ প্রতাপের কেন্দ্র শিথিল হয়ে পড়ে।'' [৫]

এই ভাবনাটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কাহিনির ঘটনাপ্রবাহ। তবে যে বিষয়টি গোটা উপন্যাসটিকে আগাগোড়া একটি সূত্রে বেঁধে রেখেছে, তা হলো আমাদের অতি পরিচিত পুরাকথা মনসামঙ্গল কাহিনি।

'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসে ভারতবর্ষীয় মিথ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, লোককথার উপাদান, অলৌকিক বাস্তবতা এসবের মধ্যে এক নতুন চিন্তা ও চেতনার সন্ধান করতে চেয়েছেন লেখক অভিজিৎ সেন। কৌম সমাজের অস্থির সাম্প্রতিককে যেহেতু ঘিরে থাকে পুরুষাণুক্রমে সঞ্চিত রহস্যময় প্রত্নস্মৃতি, সেই হেতু বর্তমানকেও গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অতীত। তাই বিশ শতকের ৯০ এর দশকে (১৯৯৫) লেখা একটি উপন্যাসের শিরোনামে উঠে আসে মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান চরিত্র 'লখিন্দর' এর নাম। এই লখিন্দরের গল্প আর সেই 'বেহুলা-লক্ষীন্দর' এর আখ্যান সম্পূর্ণ এক নয়, কিন্তু যেন মিল আছে কোথাও।

চাঁদসওদাগর ও সনকার বহু আকাঙ্খিত পুত্র লক্ষীন্দর। মনসা দেবীর প্রবল কোপে প্রাণ হারালো সে। পরে সতী সাধ্বী স্ত্রী বেহুলার ঐকান্তিক প্রয়াসে প্রাণ ফিরে পেল লক্ষীন্দর। মনসামঙ্গলের এই কাহিনির নির্যাসকে এক ভিন্ন মাত্রায় হাজির করা হলো 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়ক বালা ও মায়নোমতির মানত করে পাওয়া ছেলে। বালার জন্মবৃত্তান্ত বলতে গিয়ে লেখক জানাচ্ছেন –

"সে ভায়োরোর কালীর কাছে হত্তে দিয়েছিল। সন্তান পায়নি সে। পরের বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে জলে কাদায় ডোবা দুক্রোশ রাস্তা দণ্ডী করে সে মঙ্গলার বিষহরির থানে মানত রক্ষা করেছিল। রক্তাক্ত শরীরে বুক ছুরি দিয়ে চিরে মায়ের থানে রক্ত দেয় সে। তারপর মায়নো সন্তান পায়। ছেলের নাম সে রেখেছিল বালা – বালা লখিন্দর।'' [৬]

কিন্তু এই লখিন্দরকে কিছুতেই চাঁদ পুত্র লক্ষীন্দর এর মতো হারাতে চায় না মায়নোমতী। তাই বালাকে প্রতিপদে আগলে রাখে মায়নো। তাই কিশোর বালা যখন স্বপ্ন দেখে সে ভাদ্র মাসের ভরা নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, তখন সন্ত্রস্ত মায়নোর প্রথম প্রশ্নই হয়– 'নৌকাৎ, না মাণ্ডুসৎ'?– সে নৌকায় যায় না কলার মান্দাসে? এই প্রশ্নেই যেন একাকার হয়ে যায় চাঁদপুত্র লক্ষীন্দর আর মায়নোপুত্র 'বালা লখিন্দর'– একাকার হয়ে যায় বিশ শতক ও মধ্যযুগ। এখানে এসেই যেন মনে হয় বিশ্বাসের পরিসর সময়ের নিয়ন্ত্রণ কিছুতেই স্বীকার করে না, সে তৈরি হয়, বেঁচে থাকে মানব মনের চিরন্তনতায়।

মনসামঙ্গলের লক্ষীন্দর এর স্ত্রী বেহুলা। যে বেহুলার সতীত্বের কাহিনি সর্বজনবিদিত। আর অভিজিতের বালা ভালোবেসেছে বিদ্যাধরীকে। যে বিদ্যাধরী ট্রাক ড্রাইভারদের হাতে লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা। পরবর্তীতে বৃদ্ধ গুণমানের কাছে আশ্রিতা। এই বিদ্যাধরীর চরিত্র সম্পর্কে গুঞ্জন শোনা যায় সমাজের সর্বত্র। তাই মায়নো তার বালার পাশে কিছুতেই কল্পনা করতে পারে না বিদ্যাধরীকে। মানতে পারে না রাজকিশোর,

মানতে পারেন না সমাজের বিদ্বজ্জনেরাও। তাহলে এভাবে বেহুলার স্থানে বিদ্যাধরীকে দাঁড় করবার 'স্পর্ধা' কেন দেখালেন অভিজিৎ? 'নারীচরিত্র' শব্দটিকেই যেন নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করলেন। আধুনিক সাহিত্যকারেরা সাধারণত কোনো 'নারীচরিত্র' নির্মাণে কেবলই সতীত্ব, কোমলতা, স্নেহ, পাতিব্রত্য ইত্যাদি আইডিয়াকে মান্যতা দেন কিংবা প্রতিবাদ করেন, আর কিছু মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের আলোতে তাকে দেখবার চেষ্টা করেন। অভিজিৎ দেখালেন আজকের এই বিশ-একুশ শতকেও সাধারণ শ্রেণির নারীরা কতটা অবহেলিত, কতটা অপমানিত, কতটা শোষিত। উপনিবেশোত্তরবাদের পরিভাষায় বলা চলে, বিদ্যাধরীর পরিচায়নপর্বেই নারীকে 'অপর' হিসেবে নির্মাণের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই অনাবৃত করেছেন লেখক। মেইনস্ট্রিম সাহিত্যে ধর্ষিতার পরিসর নেই, একথা বলা ধৃষ্টতা হবে। তবে এতখানি সহমর্মিতার সঙ্গে তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তোলার মধ্যেই অভিজিতের অনন্যতা। ধর্ষিতা নারীকে মেইনস্ট্রিম সাহিত্য নিয়ে যায় আদালতে, থাকে রিরংসা জাগানো বয়ান, কেন না এই সস্তা পথই পাঠকচিত্ত জয়ের পন্থা। অভিজিৎ এই আধুনিকতার ভড়ংকে প্রত্যাখ্যান করেন, গড়ে তুলতে চান এক বিকল্প আধুনিকতা। তাঁর উপন্যাসে জয়ী হয় মানুষ, মানুষের মানবিক অনুভূতি।

'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' একটি নতুন ধরণের প্রেমের আখ্যান। এই উপন্যাসে আগাগোড়া স্মৃতি, বর্তমান, প্রত্নস্মৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা, প্রত্নকথা, কিংবদন্তী, পৌর সংগঠন পরস্পর মিলে মিশে আছে। গ্রামীণ সমাজের কুহকী বাস্তবতায় প্রত্নকথা ও কিংবদন্তীর জোরালো উপস্থিতি এই উপন্যাসের একটি প্রধান বিষয়। তবে কবিরাজ ও বিদ্যার সম্পর্ক, বিদ্যার অতীত, বিদ্যা-বালার সম্পর্ক– এই বিষয়গুলির জটিলতা উপন্যাসটিকে শুধু প্রত্নকথার নামান্তর মাত্র হয়ে উঠতে দেয়নি। এই সম্পর্কগুলির বিশ্লেষণে লেখক যেন এক গভীর মনস্তত্ত্ববিদের ভূমিকা নিয়েছেন। কবিরাজের কাছে বিদ্যাধরী আশ্রিতা। কবিরাজ তাকে আশ্রয় দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর

সম্মান দেয়নি। অজুহাত হলো 'তার কপালে স্ত্রীসুখ নেই'। কিন্তু এই বিদ্যার উত্তাল যৌবনে জ্ঞান হারিয়ে কন্যাসম বিদ্যাকে ভোগ করতেও পিছপা হয়নি। পুরুষতন্ত্রের উৎপীড়নের এক চেহারা মনসামঙ্গলের কাহিনিতে, আরেক চেহারা বর্তমান উপন্যাসে।

বালা ও বিদ্যার সম্পর্কের বিবর্তন উপন্যাসটির অনেকখানি পরিসর দখল করে আছে। বালা প্রথম বিদ্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল তার রূপেই। ধীরে ধীরে ভালোবাসা গড়ে ওঠে। আর তখনই চারদিক থেকে আসে প্রতিরোধের, প্রতাপের পীড়ন। সমাজ জানে, বিদ্যাকে ভালোবাসতে নেই,– সে 'কুলটা', 'অসতী', 'ধর্ষিতা' এবং 'অপবিত্র'। আশ্রয়দানের নামে তাকে অবাধে ভোগ, বলা ভালো যৌন শোষণ করা চলে, গণিকা হিসাবে দেখাও চলে। এতে কারোও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ভালোবেসে তাকে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন– তাকে সমাজ কী করে মান্যতা দেবে। এই হলো পতিতার সামাজিক নির্মিতি। কিন্তু এই প্রতিরোধের আঘাতে বালা ও বিদ্যা বিচ্ছিন্ন হয়নি, বরং উভয়ে মিলে করেছে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ সামাজিক প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রান্তিকায়িতের প্রতিবাদ। সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কারের সন্দর্ভকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের আকাঙ্খিত পথের দিকেই এগিয়েছে তারা। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, –

"..... সামাজিক জীবনের বিধি বিন্যাস যখন অচলায়তনে পরিণত, সেসময় ওরা যাত্রা করে নতুন সময় ও নতুন পরিসরের বিন্যাসক্রমে।'' [৭]

এই যাত্রা সমস্ত প্রান্তিকায়নের বেড়াজাল ভেঙে এক নতুন উজ্জীবনের দিকে যাত্রা। বৈষম্যময় লৈঙ্গিক সম্পর্কের স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দিয়ে আসলে সামাজিক প্রতাপেরই প্রতিস্পর্ধী হয়েছে অভিজিৎ সেনের বালা লখিন্দর। যেমন এতকালের প্রচলিত সাহিত্যধারার প্রতাপের প্রতিস্পর্ধী হয়ে এক নতুন বাস্তবতায়, নতুন আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বালা ও বিদ্যার রচয়িতা।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই উপন্যাসে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে বেহুলা লক্ষীন্দরের

প্রত্নকথা। যদিও ঘটনার পরিবর্তন ঘটেছে, চরিত্র বদলে গেছে, কাহিনির বিন্যাসও কোনো কোনো স্থানে একেবারেই আলাদা। কিন্তু তাই বলে লেখক কখনও উৎসচ্যুত হন নি। বরং কাহিনির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন প্রয়োজনের খাতিরে। কেননা আধুনিক বাস্তবতায় মনসামঙ্গলের কাহিনির ভাববস্তু বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। এটাই সময়ের দাবি। কিন্তু তাই বলে লেখক কাহিনিকে ভেঙেই হাত সরিয়ে নেননি। বরং প্রবৃত্ত হয়েছেন সময়োপযোগী পুনর্নির্মানে, যার পেছনে সক্রিয় রয়েছে ভাবাদর্শের সংঘাত। যেখানে লখিন্দর ও বিদ্যা অনেক বেশি স্বাভাবিক ও বাস্তবিক। কিন্তু এর মধ্যেও যেন দৈবানুগত্যের সংকেত রয়েছে। চরিত্রের কাঠিন্যে, মনোবলের দৃঢ়তায়, ভালোবাসার শক্তিতে, আবার মানুষই হয়ে উঠেছে দেবোপম, যেমন হয়েছিল বেহুলা। চাঁদের আলোয় এক অপার্থিব মুহূর্তে যখন বিদ্যা বালাকে দেখে তখন দৈবপুরুষের মতোই মনে হয় তাকে। যে দৈবপুরুষ পারে বিদ্যাকে সমাজের সকল প্রতিকূলতা থেকে সরিয়ে নিয়ে ভালোবাসার নির্মল ছায়া দিতে। এই অপূর্ব মুহূর্তে –

"সে মুগ্ধ হয়ে তাকালো তার পুরুষটির দিকে।... চারিদিকের গাছগুলো যেন নদীর জলের মধ্যে ঝুঁকে তাদের দেখছে। সেইসব গাছদের মাথা ছুঁইছুঁই বালালখিন্দরের মাথা। কতকাল আগে সে যেন ভেসেছিল আরেকবার? সে কত জন্ম আগে? সে কি এই মানুষের সঙ্গে? মাছ, মকর, ঘড়িয়াল, কুমির, পালে পালে শিশুমার ধেয়ে এসেছিল যে পচনধরা দেহটির লোভে, সে কি ঐ দিব্যপুরুষটির, যার মাথা এই মুহূর্তে গাছপালা ছাড়িয়ে নক্ষত্রের গায়ে গিয়ে ঠেকছে? ভয়, হতাশা, হাজার প্রলোভন জয় করেছিল কি বিদ্যা এই পুরুষের পথ চেয়েই? জয় মা বিষহরি! আমার চাঁদের সাম্পানের কাণ্ডারী তোরই সন্তান, মা। তাকে তুই দেখিস, মা। – জয় মাও বিষহরি!" [৮]

এই বিন্দুতে এসে বিদ্যাধরী ও বেহুলা এক হয়ে যায়। আপন ভালোবাসার মানুষের মঙ্গলকামনায় সমস্ত পৃথিবীর স্ত্রীজাতির ঈশ্বরের প্রতি এই প্রার্থনা– 'আধুনিক' উপন্যাসের বিষয় হতে না পারলেও সত্তর পরবর্তী নব্য আধুনিক উপন্যাসের একটি

অন্যতম প্রধান বিষয় হওয়ার উপযোগী। যেখানে একটি আধুনিককালের নারী তার অনুভূতিকে এক করে নিতে পারে একটি পুরাকালের নারীর সাথে। যেখানে মহাসময় ছায়া ফেলে খণ্ড সময়ে, মহাপরিসরের দ্যোতনা সৃষ্টি হয় খণ্ড পরিসরে। বাস্তব ও স্বপ্ন কিংবা কুহক একাকার হয়ে বাস্তবতার অভিব্যক্তি নতুন অভিমুখের সৃষ্টি করে যখন,

"বালা বলল, ভয় নাই বিদ্যাধরী, হামার নাম বালা লখিন্দর। এ যাত্রায় তুমি সওয়ারি হামি চড়নদার! আগ্‌লা জন্মের দেনা শোধ করমো।'' [৯]

তখন মনে হয় যেন এই যাত্রা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। প্রত্নকথার কালিদহ যেন উপন্যাসের এলুয়ার দহ। এই আবর্তকে পেরিয়ে যায় বিদ্যা ও বালা। পেছনে থাকে কবিরাজ গুণমানের চিতা। এই পূর্বপুরুষকেও বিদ্যা তুচ্ছ করে না। কবিরাজের হাতখানা বিদ্যাধরীর কাছে প্রতিভাত হয় 'বরাভয়ের মত একখানা হাত' হিসাবে। এখানেও দেখি অতীতকে আগ্রাহ্য করে শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন নয়, বরং অতীতকে স্বীকার করে ভবিষ্যতের সংগঠনের প্রয়াস। তাই দেখি বাস্তবের বুক চিরে বারবার ঝিলিক দিয়ে যায় রূপময় প্রত্নকথার দ্যোতনা। বালা-লখিন্দরের পিতা রাজকিশোরের চোখে বিদ্যা ও বালা হয়ে ওঠে বেহুলা লক্ষীন্দর।

"রাজকিশোর মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তার ছেলেকে। ঋজু শাল-বল্লার মত দেহকাণ্ড তার লখাইয়ের। আর কি মানিয়েছে দুজনকে, যেন সত্যিই বেহুলা লখিন্দর, যদিও ঝড়ে বিধ্বস্ত, আক্ষেপে বিপর্যস্ত তার লখাই।'' [১০]

লক্ষ করার মতো, পুরাকালের লক্ষীন্দরকে রক্ষা করেছিল যে বেহুলা, তাকে বারবার সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পুরুষের এবং প্রতাপের আপসহীন ঔদ্ধত্যের পরিণাম কিন্তু ভোগ করতে হয়েছে তাকেই। কিন্তু সে ভেঙে পড়েনি। দায়িত্বশীল নারীই কেবল রক্ষা করতে পারে মুমূর্ষ, রোগগ্রস্ত সমাজকে। 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় নারী যশোবতীই মুমূর্ষু সভ্যতার প্রতীক সীতারামকে জীবনের স্বাদ দিতে চেয়েছিল। মৃত লখাইকে নিয়ে স্বর্গপুরীতে গেছে বেহুলা। নন্দিনী নামে মানবীই তো

ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার বুকে মানবতার মন্ত্র নিয়ে গিয়েছিল, মরা প্রাণের দেশে পৌঁছে দিয়েছিল পৌষের গান। যদিও এরা কেউই বিদ্যাধরীর ন্যায় সমাজের নজরে ভ্রষ্টা নয়, সকলেই 'সতী'। কিন্তু বারেবারেই সতীত্ব প্রমাণের পরীক্ষার সম্মুখীন। অন্যদিকে বিদ্যা যে দিব্য পুরুষকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, সে লখাই মুমূর্ষ নয়, বরং বলিষ্ঠ জীবনবাদের প্রতিভু। তাই সে পারে সামাজিক সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের যুগযুগান্তরের পাপস্খালনের প্রতিজ্ঞা নিতে। 'আগ্‌লা জন্মের দেনা শোধ' এর উচ্চারণ মনসামঙ্গলের প্রতিতুলনায় এক বিকল্প প্রত্যয়ের, মিনিং বদলের এক নতুন অভিমুখেরই বাঙ্ময় অভিব্যক্তি যেন। এখানেই মিথ এর পুনর্ণির্মানের প্রক্রিয়ায় উপনিবেশোত্তরবাদী অঙ্গীকার ঘোষিত হয়, আক্রান্তজনের পাশে দাঁড়ানোর উচ্চারণে লেখকসত্তা আর নায়কসত্তা যেন একাকার হয়ে যায়।

লেখকের অন্যতম উপন্যাস 'রহু চণ্ডালের হাড়' এও আমরা লোককথা, লোকসংস্কারের এক গভীর শেকড় এর উপস্থিতি লক্ষ্য করি যা মানবমনকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। এই উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শোয়েব শাহরিয়ার বলেছেন।

"রহু চণ্ডালের হাড় ভারতীয় অনার্য সমাজের অন্তর্ভূক্ত এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের প্রবহমানতা। আর্যীয় আগ্রাসন বা আর্যীকরণের পর কয়েক হাজার বছরের স্রোতোধারায় বিচিত্রমুখী দ্বান্দ্বিক উত্থান-পতনে জাতিগত মৌলসত্তার গভীর সংকটে জীর্ণ দীর্ণ, ন্যুব্জ-কুব্জ-বিধ্বস্ত ও ক্ষয়িত অনেক জাতির একটি হলো বাজিকর সম্প্রদায়। এই বাজিকর সম্প্রদায়ের দেড় শতাব্দীর ক্রনোলজি হলো 'রহু চণ্ডালের হাড়'।" [১১]

আর্যীকরণের ঔপনিবেশিকতায় ক্লিষ্ট জাতির দেড় শতাব্দীর ক্রনোলজি নির্মাণে যেহেতু লেখক অভিজিৎ প্রয়াসী তাই তাঁর আখ্যান রচনায় প্রধান উপাদেয়ই হয়েছে অনার্য, লোক উপাদান। পিতৃপুরুষ রহুর অস্থি কথানাকে অব্যর্থ আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ

করে এগিয়ে গেছে একটি গোটা জাতি। অলৌকিক শক্তির উৎস স্বরূপ হাড়কখানাকে হাতে নিয়েই সুস্থির ও সুস্থিতি সম্পন্ন জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু এই হাড় এর ইতিহাস অন্বেষণ করলে যে পুরাকথার সন্ধান মেলে তাতে একটি ঐতিহাসিক বৃত্তের আভ্যন্তরীণ শোষণের ইতিহাসটিই যেন আভাসিত হয় বিশেষভাবে। বাজিকরদের পূর্বপুরুষের আখ্যানটি এরকম –

"পুরাকালে এদেশে প্রাচুর্য ছিল, অগাধ অপার জীবন ছিল, অনিঃশেষ আনন্দ ছিল। এই নিরবচ্ছিন্ন সুখাবিষ্টতায় একসময় রহু হয়ে এলো বিদেশী এক আগ্রাসী, যে স্বভাবে ছিল হিংস্র, নৃশংস। অপেক্ষাকৃত উন্নত শস্ত্রধারী ভিনদেশী আগ্রাসী পরবর্তীতে বিশাল শক্তিশালী এক বাহিনী নিয়ে সবকিছু দখল করে বসে এবং রহুর পবিত্র নদী ও তার জলধারা ওদের জন্য নিষিদ্ধ করে। ওরা নদীর পারে মন্দির স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত নদীর অধিকার নিয়ে তুমূল সংঘর্ষ হয় এবং পরাজিত রহুর বক্ষদেশ ক্ষত-বিক্ষত হয় খড়গাঘাতে এবং সেই নদীতেই ছিটকে পড়ে। রহুর অনুগামীরাও তাকে অনুসরণ করে।'' [১২]

রহুর বুকের রক্তের বন্যায় ফুলে ওঠা নদীতে রহুর এই অনুগামীরা ভেসে যায় শেষ পর্যন্ত এবং বন্যার বেগ শান্ত হলে সেই রহুর দেহের অস্থি কয়খানিকে জীবনের সম্বল হিসেবে গ্রহণ করে নেয় তার অনুগামীরা। এই কাহিনিটি বিশ্বাস করেই বছরের পর বছর ধরে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে আছে বাজিকরেরা। কিন্তু এই পুরাকথাকে একটু কাছ থেকে দেখলেই আমরা এর মাঝে আরেকটি কাহিনির সূত্র পাই। এই কাহিনি হলো শোষক দলের শোষিতদের ওপর উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনি, যার মধ্যে 'অপর' নির্মানের আখ্যান ও আপন ভূমিতে পর হিসেবে বিবেচিত হওয়ার করুণ গাঁথা প্রতিস্থাপিত রয়েছে। একটি গোটা জাতিকে 'নিষিদ্ধ' করে দেওয়া হচ্ছে, বেঁচে থাকার সর্বপ্রথম উপাদান জল এর অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করতে চাইলে খড়গের ভয় তো রয়েছেই। তবে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষয়টি তা হলো মগজ

ধোলাই-এর মাধ্যমে তাদের বোঝানো হচ্ছে তারা ব্রাত্য আর একটা গোটা জাতি তাদের এই তথাকথিত যথাপ্রাপ্ত স্থানটিকে স্বীকারও করে নিচ্ছে। তারা বিশ্বাস করছে তাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বনই হল তাদের কাঁধের ঝুলি। এই ঝুলির ভেতরে আছে রহু চণ্ডালের হাড় যা অসাধ্য সাধন করতে পারে। অভিজিৎ সেন এই লোকদের প্রত্যক্ষ দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তাদের বিশ্বাসের গভীরতাকে। তিনি বলছেন –

"আমার দেখা বাজিকরদের বিশ্বাস 'আগে' রহুর হাড়ের এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা সত্যিই ছিল। এখন নাকি আসল হাড়টাই হারিয়ে গেছে।" [১৩]

এভাবেই একটি বাস্তব সমস্যা পুরাকথা হয়ে একটা গোটা জাতির কাছে বিশ্বাসের একটা সর্বপ্রধান জায়গা হয়ে যাচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে তাদের আধুনিক বাস্তব। এই ব্যাপারগুলিকে কেবল বুজরুকি বলে নাক সিঁটকে চলে গেলেই কি আমরা আধুনিক সাহিত্য নির্মাণে সফল হতে পারব। না কি এই পুরাকথা সমূহের বিনির্মাণ ঘটিয়ে এর মাঝে লুকিয়ে থাকা বাস্তবকে উন্মোচন করতে পারলেই হওয়া যাবে সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধ। 'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে অভিজিৎ এই উন্মোচনেরই প্রয়াস করেছিলেন। কারণ তিনি মনে করেন, সমাজ, সংস্কৃতি ও জায়মান ইতিহাসের পটে মানুষকেও তার ব্যক্তি ও সামূহিক জীবনের সমস্যা সংকট উত্তরণের প্রয়াসকে তুলে ধরা, বোঝার চেষ্টা করা হলো আধুনিক উপন্যাসের দায়। তাই বাংলা উপন্যাসের যথার্থ মুক্তির উদ্দেশ্যে লেখক সন্ধান করেন নতুন পথের, কথাবয়নের নতুন রীতির। লোককথা- মিথ কিংবদন্তী মঙ্গলকাব্য ইত্যাদির মধ্যে দেশজ আখ্যানবয়নের যে পরম্পরা– সেই পরম্পরাকেই বরণ করে নেন তিনি। লেখক নিজেই বলেছেন –

"আমি লোককথার আখ্যানও উপন্যাসে নানাভাবে বিন্যস্ত করি। আখ্যানের অংশ, আখ্যানের চরিত্র, গান, ছড়া, মঙ্গলকাব্য– তার রহস্যময় বাস্তবতা, যা আমাদের প্রাকৃত মানুষের চরিত্রকে ধরতে, বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে, এসব ও আমি উপন্যাসে আনি।" [১৪]

এই বিষয়গুলিকে আধুনিক উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার মূল কারণই হচ্ছে এর লুকিয়ে থাকা এক অব্যক্ত ইতিহাস, যার উন্মোচন একমাত্র বিনির্মাণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। রহুর অনুগামীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে শোষকেরা কেবল খড়গের জোরই লাগায়নি, লাগিয়েছে বুদ্ধির জোরও। বাজিকরদের পূর্বইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে কীভাবে পুরা ও পালি, যারা বাজিকর সম্প্রদায়ের পূর্বসূরী তারা তাদের ভাই-বোন হওয়ার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রেমের বন্ধনে লিপ্ত হয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, এই ইতিহাসকে পাপের ইতিহাস প্রমাণ করে বাজিকরদের অন্তরে আত্মগ্লানির উন্মেষ ঘটিয়ে তাদের 'নিষিদ্ধ' প্রমাণ করেছিল এই শোষক দল। পবিত্র নদীর অধিকার থেকে বাজিকরদের বঞ্চিত করে, তারা মন্দির স্থাপন করেছিল। এই মন্দির স্থাপন একটি রূপক। যার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে, কীভাবে প্রতিষ্ঠান ব্রাত্য প্রমাণ করে সরিয়ে দিচ্ছে একটি জাতিকে তার আপন অধিকারের জায়গা থেকে। আর্যরা এদেশের জনতাকে 'দাস', 'দস্যু' ইত্যাদি নাম দিয়েছে আর্যসাহিত্যে। উৎখাত করেছে তাদের আপন ভূমি থেকে। সরল সহজ অনার্যদের উৎখাত করেছিল বুদ্ধির বলে। নিজভূমে পরবাসী হয়ে প্রান্তিকায়িত জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল তারা। আর অনার্যরা মেনেও নিয়েছিল তাদের এই অবস্থানকে, কেননা তাদের বোঝানো হয়েছিল এই অবস্থানই তাদের প্রাপ্য। এই মেনে নেওয়া চলছে বছরের পর বছর ধরে। কেবল যে বাজিকরদের উপর এই শোষণ, এমন নয়, এই শোষণ সাঁওতালদের ওপরও, যার প্রমাণ রয়েছে উপন্যাসে –

"যে যেমনভাবে পারে এই জটিলতাবর্জিত হড়কে বুঝ দিচ্ছে, তা ওজনে হোক কিংবা পয়সায় হোক। আর কী আশ্চর্য, এরা বুঝে যাচ্ছে, মেনে নিচ্ছে, খুব সে অখুশি তাও মনে হচ্ছে না।" [১৫]

সমাজের অধিপতিরা এদের ব্যবহার করে, এদের ওপর অত্যাচার করে, আর এরা এই অত্যাচার, এই শোষণ নীরবে মেনে নেয়। এদের চেহারা নিরীহ, চোখ শান্ত। দয়ারাম

ভকতের চাকর সাওতাল যুবকের বর্ণনায় এর প্রমাণ রয়েছে –

"তার চাকর মোষের দড়ি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। একজন সাঁওতাল। অদ্ভুত শান্ত আর নিরীহ দেখতে মানুষটাকে। এতক্ষণে কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। লোকটা জোয়ান এবং বিষন্ন।

দয়ারাম গাছে বাঁধা ঘোড়ার কাছে গেলে সেই সাঁওতাল মোষের দড়ি ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে। দয়ারাম তার ঘাড়ের উপর পা দিয়ে ঘোড়ায় উঠে আড় হয়ে বসে।'' [১৬]

আজকে যে সাঁওতাল এর পিঠে পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ছে দয়ারাম ভকতের মত ভ্রষ্ট দারোগা, একদিন এই গোটা রাজমহল, বারহেট আমগাছিয়া, পিপড়া অঞ্চল এদেরই আবাস ভূমি ছিল। এরাই এই অঞ্চলের আদিবাসী, কিন্তু আজ এরাই আক্রান্ত। যেমন আক্রান্ত হয়েছিলেন রামের দ্বারা লঙ্কায় রাবণ। অনার্য সভ্যতার প্রতিভূ রাবণকে সীতা হরণের দায়ে হারাতে হয়েছিল নিজভূমি। এই সীতাহরণ প্রতীকী। সীতাকে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ধরলে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন আপন ভূমির স্বার্থে। কিন্তু যে রাম প্রজারঞ্জনের স্বার্থে বিনাবাক্য ব্যয়ে দুর্মুখের কথার ভিত্তিতে সীতাকে ত্যাগ করতে পারেন, তিনিই সীতা উদ্ধারের জন্য অনার্য রাবণকে অন্যায় সমরে একে একে শতপুত্রের শোক দান করেছিলেন। আর্য রাম বুদ্ধিবলে ছলনার মাধ্যমে যেভাবে ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করতে পারেন, বলনির্ভর রাবণ তা কখনই পারেন না। তাই তার পরাজয় হয় নিশ্চিত। এই পুরাকথাটির নানান রূপ আমরা বাল্মীকি, কৃত্তিবাস, মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনায় পেয়েছি। কখনও বাল্মীকির সময়ে রচয়িতার ভাবাদর্শ ও দেশকালের বাস্তবতা, বাল্মীকির সময়, আর্য আগমন, আর্য অনার্য দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ভিত্তিতে এবং যেহেতু স্থিতাবস্থা আর্যদের পক্ষে তাই রাম হয়েছেন নরোত্তম আর রাবণ অন্যায় পথের দিশারী। কখনও কৃত্তিবাসের সময়, মধ্যযুগে ভক্তির প্রাবল্য, ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে এই পুরাকথাটিই বিনির্মিত হয়ে রাম হয়েছেন ভগবান আর রাবণ রাক্ষস। আবার

কখনও মধুসূদনের সময়ে দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির রাজত্ব, দেশকে স্বাধীন করার প্রবল আয়োজন দেশবাসীর– এই প্রেক্ষিতে রাবণ আক্রান্ত দেশের সাহসী সম্রাট আর রাম বিদেশী আক্রান্তকারী। এইভাবে বারে বারে সময়ের পাটাতনে ভাঙে পুরাকথা। যেমন ভেঙেছে 'রহু চণ্ডালের হাড়' এ। এখানে শারিবার চোখ দিয়ে লেখক বাজিকরদের পূর্ব ইতিহাসকে দেখাচ্ছেন পাঠকদের। এই চোখ, কোনো আধিপত্যবাদীর নয়, এ চোখ প্রান্তিকায়িতের, এ চোখ আক্রান্তের। তাই তার কাছে এতকাল ধরে চলে আসা বাজিকরদের মধ্যে মান্য পুরাকথার ভাঙন ঘটছে। তাই শারিবার নানি লুবিনি যখন তাকে বোঝায় বাঁশবাজি, দড়িবাড়ি, ভান্‌মতির খেলা দেখানো– এসবই বাজিকরের কাজ। বলে–

"এলা সব ভিখ্ মাঙ্গার কাম।" [১৭]

তখন শারিবার এই 'ভিখ-মাঙ্গা' কথাটা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। সে ভাবে–

"খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার, সেটা ভিখ্-মাঙ্গা হবে কেন?" [১৮]

এভাবেই প্রত্নকথাকে ভেঙে এক ভিন্ন আধুনিক বাস্তবকে অভিজিৎ তুলে আনেন তার রচনার আধেয় রূপে, যেখানে উত্তরবঙ্গের গ্রামসমাজে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি বিভক্ত সামাজিক পরিসরে বহু মানুষ জনের ক্রিয়াকলাপে 'রহু চণ্ডালের হাঁড়' উপন্যাসটি হয়ে ওঠে– *"গল্প-গাথা-গান মিলিয়ে মিশ্র শিল্পের বুনট।"* [১৯]

কেবল প্রত্নকথাকে পুনঃসৃজন নয়, ইতিহাসের মধ্যে এক নতুন ইতিহাসের সন্ধানের প্রয়াসীও হয়েছেন লেখক অভিজিৎ সেন। তাঁর 'রাজপাট - ধর্মপাট' উপন্যাসে চৈতন্যদেবের বিনির্মাণ এই প্রয়াসেরই একটি উদাহরণ। চৈতন্যদেবের পরিচয় যে কেবল ধর্মগুরু বা বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক মাত্র নয় বরং তার সমাজচিন্তা রাজনীতিজ্ঞান যে কতটা বাস্তবসম্মত ছিল, তা লেখক যেভাবে দেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন তা সম্ভবত এর আগে আর কোন লেখকই করেন নি। 'রাজপাট-ধর্মপাট' উপন্যাসে চৈতন্যদেবের বিনির্মাণের আলোচনার আগে আমাদের চৈতন্যদেব ও তাঁর সময়কে একটু কাছ থেকে দেখার চেষ্টা

করা দরকার।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের কেন্দ্রমণি নিমাই পণ্ডিত ওরফে শ্রীচৈতন্য ব্যবহার রসে মত্ত বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন ভক্তি রসের প্লাবন, এই প্লাবনে ভেসে গেছিল জাত-বর্ণের যাবতীয় নিশ্চল প্রাচীর। শুদ্ধ নাম প্রেম আর কীর্তনানন্দে বাংলাকে মাতিয়ে তোলাই তাঁর জীবনের একমাত্র কীর্তি নয়, সনাতন হিন্দু ধর্মের যাবতীয় জীর্ণতা আর জাতের নামে বজ্জাতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক মূর্তিমান প্রতিবাদ। সততা বিচ্ছিন্ন মুমূর্ষু পঞ্চদশ শতকের বাঙালি সমাজে চৈতন্য যেন মৃত সঞ্জীবনী সুধা, বাঙালির জাতীয় ঐক্যের সূত্রধার তিনি। তাঁর একক প্রভাবে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচনা হয়েছিল।

একদিকে আধিপত্যগর্বী ব্রাহ্মণাদি বর্ণহিন্দু, অপরদিকে জল-অচল অচ্ছ্যুৎ লোকসমাজ - বাংলার সামাজিক সংগঠনে এই দুই স্পষ্ট পৃথক অংশের মধ্যে দ্বিমেরু বিষম দূরত্বের সুযোগ নিয়েই তুর্কীরা এদেশ দখল করেছিল। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তুর্কীদের প্রতিহত করতে আসেনি, বরং তারা এতে খুশিই হয়েছিল - রামাইপণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' তার সাক্ষ্য দেয়। এই সামাজিক অসংহতির দরুন ইসলামের সাংস্কৃতিক বিজয়ও সম্ভব হয়েছিল। বর্ণাশ্রম প্রথার চাপে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের উদার সাম্যবাদ একটা আশা জাগিয়ে ছিল। দলে দলে ধর্মান্তরিত হওয়ার এটি একটি অন্যতম কারণ। চৈতন্যের ইতিহাসবোধও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই উদার মানবপ্রেমকেই তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনের আয়ুধ করে তুলেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি বললেন - 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়নঃ।'

যাবতীয় বিভেদের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলনের মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে চৈতন্য মূর্তিপূজার বিপরীতে নামপ্রেমকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই মানবতাবাদী সাম্যচিন্তার স্ফূরণকে পণ্ডিতেরা বলেছেন রেনেসাঁ। এই রেনেসাঁ বর্ণ, কূল, কৌলিণ্য,

বংশমর্যাদা, বিদ্যা, অর্থ ও প্রতিষ্ঠার বিচার না করে মূল্য দিল আন্তরিকতাকে, মূল্য দিল ভালোবাসাকে, মূল্য দিল মনুষ্যধর্মকে। নতুন বীজমন্ত্রে চৈতন্যধর্মের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হলো সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। বাঙালির সামাজিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হলো এভাবেই যা অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই প্রক্রিয়া এতটা সহজ ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিচালন ক্ষমতা, সাধারণকে প্রভাবিত করার মত ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি একটি সৎ উদ্দেশ্য যার প্রতিটিই চৈতন্যদেবের ছিল। আর সবচেয়ে বড় ছিল তার সমাজের অবক্ষয়ের জন্য গভীর আক্ষেপ এবং তা পরিবর্তনের প্রবল আকাঙ্খা, এই আকাঙ্খাই সন্ন্যাসী চৈতন্যকে সমাজের জন্য, সমাজের মানুষের জন্য ভাবিত করেছিল। এই চিন্তার টানেই সম্ভবত তার রামকেলি গমন, রূপ-সনাতনের সাথে গোপন সাক্ষাৎকার, শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈতের সঙ্গে গভীর আলোচনা। 'রাজপাট - ধর্মপাট' উপন্যাসে শেষোক্ত বিষয়গুলিই কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

ইতিহাসের একটি বিশেষ কালকে উপন্যাসটি পড়ার সময় লেখক মাথায় রাখার নির্দেশ দেন-

"ইতিহাসের একটি বিশেষ সময় যেহেতু এই উপন্যাসের উপজীব্য, সামান্য দু-একটা সন তারিখ খেয়াল রাখলে পাঠকের সুবিধা হবে। চৈতন্যদেবের জন্ম - ১৪৮৬ খ্রিঃ, হোসেন শাহর সিংহাসন দখল - ১৪৯৩ - ১৪৯৪, প্রতাপরুদ্রের সিংহাসন আরোহন - ১৪৯৭, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ - ১৫১০, ঐ বছরই নীলাচল যাওয়া, ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর দেশে ফিরে ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুনের মধ্যে কোন এক সময়ে রামকেলি গমন এবং এর কয়েকদিন পরে শান্তিপুর হয়ে তিনি পুনরায় উড়িষ্যা ফিরে যান। এর মাস দুয়েকের মধ্যে হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন।"[২০]

এই নির্দেশের কারণ সম্ভবত এই ঘটনাগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত বলেই লেখকের ধারণা। অচিন্ত্য বিশ্বাসের লেখা 'মালদহে শ্রীচৈতন্য' নামক প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে রাজা

হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্যদের মধ্যে যে উচ্চাশা অঙ্কুরিত হওয়ার কথা আছে, এরকমই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে 'রাজপাট-ধর্মপাট'-এর আখ্যান অংশ আরম্ভ।

"সন্ন্যাসী যে রামকেলিতে আসছেন এবং এই আগমনের পিছনে যে তাঁদেরই উদ্যোগ অমর অথবা তাঁর ভাই সন্তোষ, দুজনের কেউই গৌড়েশ্বরের কাছে আগাম সে কথা জানায় না। তারা অবশ্য জানত রামকেলিতে চৈতন্য চন্দ্রোদয় হলে, সে প্রভা ঘনমেঘের আড়াল ভেদ করেও সারা গৌড়ে ছড়িয়ে পড়বে।''[২১]

এই অমর সন্তোষই চৈতন্যদেবের রূপ ও সনাতন। তারা গুপ্তভাবে দেখা করছে মহাপ্রভুর সঙ্গে। রূপ, সনাতন ছাড়াও আরও অনেক হিন্দু পার্ষদ আছেন রাজা হোসেন শাহ -এর। অমর সন্তোষের ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত উচ্চ রাজকর্মচারী, কেশব ছত্রী আছেন রাজার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান। তবে -

"এইসব হিন্দুদের সম্পর্কে যে সাধারণ কথাটা বলা যায়, তা হল, এরা সামাজিকভাবে প্রায় সকলেই পতিত এবং সেই কারণে কিছুটা নিগৃহীতও বটে।''[২২]

যার ফলস্বরূপই তারা বর্তমানে কেউ 'খান' পদবিধারী আবার কেউ মুসলমান রাজার 'খাস'। এই ধর্মান্তরণের পেছনে যে হিন্দু বর্নাশ্রম প্রথাই মূল কারণ তা চৈতন্যদেব অনুভব করতে পারেন, তাই তিনি বলেন -

"পাতিত্য দোষ ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিগ্রহ। ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিজ স্বার্থের কারণেই সে সব তৈরি। শাস্ত্রে তার প্রশ্রয় নেই। নবদ্বীপের ভট্টাচার্যরা একারণে আমাকে নিগৃহীত কম করেন নি। আমি যা সত্য বলে জেনেছি তার সম্যক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে সন্ন্যাসও নিতে হয়েছে। আপনারা উভয়েই শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি ভয় পাবেন না। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের কদাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করতেই হবে। আপনারা আমার সহায় হলে আমরা সমগ্র দেশ জুড়ে একটা প্রবল আন্দোলন তৈরি করতে পারব, যা অবশেষে ধর্ম এবং সমাজ উভয়েই বাঁচাবে।''[২৩]

বঙ্গে ইসলামীকরণ প্রতিরোধ চৈতন্য জীবনের অন্যতম কীর্তি। অবহেলিত

অস্পৃশ্যদের মর্যাদাদানের যে আন্দোলন তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তা ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রয়োজনকেই অবান্তর করে দিয়েছিল। চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দের উদ্যোগে পানিহাটিতে সংঘটিত চিড়া মহোৎসব এই নীরব সংগ্রামের এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। বঙ্গে হিন্দু - মুসলমান সমন্বয় চেতনারও দিশারী চৈতন্যদেব। বহু মুসলমান চৈতন্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। যবন হরিদাস ছিলেন চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ। চৈতন্যদেব এমন করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন-

"ধর্ম ও সমাজকে আচার সর্বস্বতার পথ পরিবর্তন করে ভক্তি ও প্রেমের, শুধু ভক্তি ও প্রেমের সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিতে হবে। জাতপাতের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদের। ধর্মেরও বিবর্তন আছে। ধর্মকেও সময়োপযোগী করে নিতে হবে।" [২৪]

সমাজনেতা হিসাবে চৈতন্যকে বির্নিমাণ করেছেন লেখক। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই নতুন, বস্তুবাদী বিনির্মাণ চৈতন্যকে কৃষ্ণনাম শুনেই উন্মাদ হয়ে ওঠা এক স্নায়ুদুর্বল মহাপুরুষের পরিচিতির সীমানা থেকে বের করে আনে। অভিজিৎ যা করেছেন, অ্যাকাডেমিক গবেষণায় তাই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বিখ্যাত অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী তার 'বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থে। অভিজিৎ দেখাচ্ছেন, চৈতন্য আকস্মিকভাবে অহংকারী অধ্যাপক থেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হন নি। গয়াশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ে চৈতন্যের রূপান্তর। তার জীবনের এই রূপান্তর নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ঘটেছে। জীবনীকাব্যগুলি এই ঘটনাটি খুব সংক্ষেপে দেখিয়েছে। বড়মার গোপালমন্ত্র ধারণ করার পরই এক লহমায় মানুষটার বদলে যাওয়া – অবতারের দৈবী লীলা হিসেবেই দেখেছেন বৈষ্ণবেরা। ঔপন্যাসিক দেখাচ্ছেন, সময়ের দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন চৈতন্য। প্রচলিত ধর্মের নামে যে আচার সর্বস্বতা, তার বিরুদ্ধে যাওয়ার পথ ও পন্থা নিয়ে ভেবেই তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। এসবই একটি প্রবল মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণকৌশল।

"ধর্মেরও বিবর্তন আছে। ধর্মকেও সময়োপযোগী করে নিতে হবে" [২৫] -

রাজপাট-ধর্মপাট এ চৈতন্যদেবের মুখ থেকে নিঃসৃত এই মন্তব্য আর চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতারমাত্রে সীমায়িত করে রাখতে পারে না, মহাপ্রভু পান একজন চিন্তাশীল, সমাজের নিম্নগামিতার পথ পরিবর্তনে প্রয়াসী, সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা দলনেতার মর্যাদা। এরকম একজন দলনেতার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল সেই সময়ের হিন্দু সমাজকে বিলয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে। তাই সকলেই সকল বন্ধন ছিন্ন করে মহাপ্রভুর নাম প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এগিয়ে যান তাদের একান্ত আপনার 'সোনার গৌরাঙ্গ' এর সাথে।

চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাচ্ছেন, সঙ্গে আছেন নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর এবং যবন হরিদাস। পথে নিচ্ছেন রামকেলিতে বিরাম, আর রামকেলিতে এই কাল যাপনেই সন্ত্রস্ত রাজা হোসেন শাহ। শ্রীচৈতন্যের প্রতি পদক্ষেপের খবর নিচ্ছেন চরের মুখ থেকে। যদিও,

"হিন্দু সন্ন্যাসী বা সাধুপুরুষদের রাজ্যের শাসক পরিবর্তনে অংশগ্রহণ বা চক্রান্ত করার কথা শোনা যায়নি।" [২৬]

কিন্তু তা সত্ত্বেও 'চরম সতর্ক এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল রাজা হোসেন শাহ' বিস্মৃত হন না তাঁর পরম শত্রু গজপতি রাজ প্রতাপরুদ্র, যার সাথে বহুকাল থেকে গৌড়প্রদেশ যুদ্ধে লিপ্ত, সেই প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের পৃষ্ঠ পোষক। হোসেন শাহ তাই সন্ত্রস্ত। তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবেন-

"প্রতাপরুদ্র যাঁর পৃষ্ঠপোষক সেই সন্ন্যাসী হাজার খানেক শিষ্যসামন্ত নিয়ে এখন তার নাকের ডগায় রামকেলিতে বসে আছেন। আর তাঁকে আপ্যায়ন করছে তারই দুই পরম প্রভাবশালী মন্ত্রী।" [২৭]

সম্ভবত তাকে বিচলিত রাখে বহুকাল আগে সমস্ত গৌড়ে ছড়িয়ে পড়া একটি গুজবের ইতিহাস -

"চৈতন্যদেবের জন্মের কয়েক বছর আগে সমগ্র গৌড়দেশে একটি গুজব রটে যায়

যে একজন অত্যন্ত শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হবে যিনি যবনদের বিতাড়িত করে গৌড়ের ব্রাহ্মণ রাজা হয়ে বসবেন। নবদ্বীপে এই গুজব নিয়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে পিরাল্যা গ্রামের মুসলমানেরা নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের উপরে চড়াও হয় এবং গৌড়ে রাজাকে সতর্ক করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।'' [২৮]

মুসলমান নির্যাতনে ক্ষুব্ধ বর্ণহিন্দু অংশ থেকেই যে এই গুজব উঠেছিল, অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না।

আবার এই ইতিহাসই অমর সন্তোষদের মত হিন্দুদের মনে জাগায় একটি সম্ভাবনার আভাস। তাই তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে চৈতন্যদেবের রামকেলিতে আগমনের। প্রভু এলে তাঁর কাছে তুলে ধরে তাদের এতদিনের নির্যাতিত হওয়ার ইতিহাস, চায় এর থেকে পরিত্রানের পথ। তাই সন্তোষ চৈতন্যদেবকে বলেন -

"আপনার জন্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে অধীর অপেক্ষায় আছি। বিগত দু-তিনশো বছরে গৌড়ভূমিতে যে পরিমাণ ধর্মবিপর্যয় হয়েছে, আগে কখনো তেমন হয় নি। সনাতন ধর্মে যে পরিমান ক্লেদ জমেছে, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সে সব আর সংস্কার হবার নয়। জাত-পাত-ছ্যুতমার্গ মানুষের, বিশেষ করে সমাজের উচ্চস্তরে, এমন বিকার সৃষ্টি করেছে যার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার উপায় আর দেখিনা।'' [২৯]

তাই তারা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে রামকেলিতে আনয়ন করেন শ্রীচৈতন্যকে। গুপ্তভাবে দেখা করতে আসেন তাঁর সঙ্গে। ভাবেন চৈতন্যদেবকে মাধ্যম করেই গৌড়ের সিংহাসনের অধিকর্তা বদলের রাজনীতিতে সফল হবার কথা। যদিও চৈতন্যদেব হিন্দু-ধর্মের এই ছ্যুতমার্গের সপক্ষে নন বরং চরম বিরোধী, কিন্তু এও ঠিক তাঁকে সামনে রেখে যে একটি বিরাট রাজনীতি চলছে তার অনুমানও তিনি করতে পারেন সহজেই। আর একথা স্পষ্ট প্রকাশেও কুণ্ঠিত হন না-

"চৈতন্য হেসে বললেন, 'বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে

বটে। কথা হয়েছে অদ্বৈত আচার্যর সঙ্গেও কিন্তু আপনারা যেন ধরে নেবেন না যে আমি আপনাদের অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এইসব পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আমার আরব্ধ কাজ কিছু ভিন্ন'।''[৩০]

আসলে অমর ও সন্তোষ অর্থাৎ রূপ ও সনাতানের অবস্থা এবং অবস্থান, গৌড়ের মানুষের, বিশেষ করে উচ্চবর্গীয় এক শ্রেণির হিন্দুদের গোপন আকাঙ্খা এবং সেই কারণে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বে দিশেহারা তারা।

কেবল রূপ - সনাতনের ইতিহাসই নয়, রাজা গণেশ, প্রতাপরুদ্র, হোসেন শাহ, সুবুদ্ধি রায়, রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ, রঘুনন্দন, কেশবছত্রী, নিত্যানন্দ, তমসা, সুগত, প্রত্যেকেরই মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক একটি নতুন অধ্যায়ের উন্মোচনের প্রচেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর এই 'রাজপাট - ধর্মপাট' উপন্যাসটিতে। চৈতন্যদেবের 'আরব্ধ কাজ' কি ছিল তা পরবর্তীতে সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আজও ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে, কিন্তু সেই আরব্ধ গন্তব্যে পৌঁছানোর ইতিহাসে ধর্মপাটের সাথে রাজপাটের বা রাজনৈতিক পাঠের যে কীভাবে ঐকান্তিকতা ঘটেছিল তা এতকাল একেবারেই সাহিত্যিক আলোচনায় উপেক্ষিত রয়ে গেছিল। লেখক অভিজিৎ ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজে বের করলেন সেই অনালোচিত ইতিহাস যাতে চৈতন্যদেব পেলেন এক নতুন মাত্রা, এক নতুন পরিচয়। এটাই তো বিনির্মাণ, বিনির্মাণের মধ্যদিয়ে নবনির্মাণ।

বিনির্মানের প্রয়াসী লেখক নিজেই, প্রমাণ প্রতিটি পরিচ্ছেদের শীর্ষে উপস্থাপিত বিভিন্ন চৈতন্য জীবনী কাব্য, চর্যাগীতি, গৌড় অঞ্চলের লোকপ্রবাদ, ইত্যাদির উদ্ধৃতি। কখনও 'চৈতন্যমঙ্গল' এর ঃ

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হবপাছে।।
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা।।''[৩১]

আবার কখনও 'চৈতন্য চরিতামৃত' থেকে -

"ঘরে আসি দুইভাই যুবতি করিঞা।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইঞা।।
অর্ধরাত্রে দুইভাই আইলা প্রভুস্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে।।"[৩২]

যখন এই উদ্ধৃত অংশগুলি শিরোশোভিত করে একেকটি পরিচ্ছেদ এল, তখন পাঠক বুঝতে পারলেন এই এক একটি পংক্তি কত বৃহৎ ইতিহাসের পরিচয়বাহী। আমাদের বঙ্গদেশের ইতিহাসের কত অনাবিস্কৃত রাজনৈতিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে যা একুশ শতকেও সমান আকর্ষণীয় এর নতুন রূপে, নতুন স্থানে। পুরাকথার নবভাষ্য সৃজনে দক্ষ অভিজিৎ তাই বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন চৈতন্য জীবনপর্ব।

'রাজপাট - ধর্মপাট' উপন্যাসের একটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং একমাত্রিক আলোচনা আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করলাম যেখানে উপন্যাসে আলোচিত অধিকাংশ প্রসঙ্গই বাদ গেল। তবে এককথায় যদি উপন্যাসটি সম্পর্কে বলার চেষ্টা করি, তবে উপন্যাসের একটি স্থানে শ্রীচৈতন্য রূপ ও সনাতনের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

"গৌড় রাজত্বের পূর্ব ইতিহাস এবং রাজনীতি আমি আর একটু বিস্তারিত বুঝতে চাই সনাতন,"[৩৩] আমরা পাঠকেরাও শ্রীচৈতন্যের ন্যায় গৌড় রাজত্বের পূর্ব - ইতিহাস ও রাজনীতির প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখার প্রচেষ্টা করলে এই 'রাজপাট - ধর্মপাট' উপন্যাসটি আমাদেরকে অনেকটাই সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

লেখক তার রচনায় লোককথা, গান, মঙ্গলকাব্যের রহস্যময় বাস্তবতা, যা আমাদের প্রাকৃত মানুষকে ধরতে বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে, তাকেই নানাভাবে তুলে আনতে চেষ্টা করেন। যার সার্থক প্রমাণ লেখকের 'দেবাংশী' উপন্যাস বা বড়গল্পটি। লোহার গ্রামের সারবান, গ্রামের লোকেদের কাছে বড়ই শ্রদ্ধার পাত্র কারণ

সে দেবতার অংশবিশেষ, সে দেবাংশী। লোকের বিশ্বাস যে তার ওপর দেবতা আশ্রয় করেন। এই সময় তার ভর হয়।

"আর যখন ভর হয়, তার কথা দৈববাণী।" [৩৪]

এই অতিপ্রাকৃত শক্তি দেবাংশীকে নির্ভর করেই বাঁচতে চায় শোষিত গোষ্ঠী, হতে চায় সংঘবদ্ধ, গড়ে তুলতে চায় আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এখানে সারবানকে একটি গোষ্ঠীর জাগরণের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছেন লেখক। সম্ভবত আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায়ই তিনি আস্থাশীল। সম্ভবত তিনি মনে করেন তথাকথিত আধুনিকতার ব্যক্তিসর্বস্বতা কাটিয়ে আমাদের যাত্রা করতে হবে দেশজ ঐতিহ্যের দিকে।

'দেবাংশী' গল্পের আখ্যান একজন বিশেষ ব্যক্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে। এই ব্যক্তি সারবান, সারবার লোহার। পরিচয়েই স্পষ্ট বর্ণসমাজের একেবারে নীচের তলার প্রান্তিক ব্যক্তি এই রচনার সূত্রধার। এই সারবান রাখালি করে জোতদার দৈত্যারি মণ্ডলের কাছে। কারণ তার বাপ হীরামন লোহার সারবানের মায়ের অসুখের সময় পঞ্চাশটাকা ধার নিয়েছিল দৈত্যারির পিতা রঘুনাথ মণ্ডলের কাছে। কিন্তু *"মা বাঁচেনি। দেনা শোধ করে জমি ফেরত পাবার আশায় অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে দু'বছরের মধ্যে হীরামনও মরে। আট বছর বয়সে সারবান তখন রঘুনাথের বাড়িতে রাখালি করতে আসে।"* [৩৫]

অর্থাৎ বাপের ধার শোধ করতেই সারবান দৈত্যারি মণ্ডলের বাধা চাকর হয়ে যায়। পৈতৃক পাঁচবিঘা সম্পত্তিও চলে গেছে জোতদারের কব্জায়। এমনই একটি প্রেক্ষাপটে দুর্বল, ক্লান্ত, শোকার্ত এবং সম্ভবত স্নায়ুদুর্বল সারবানের দৈবী মাহাত্ম্য আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারক বিরাম গুনমান। খেরা গাছে হেলান দিয়ে বসে থাকা, ঢোলকের বাদ্যে হুশ হারানো কিশোর সারবানের মাধ্যমে আপন গুণমানি প্রমাণ করতে বিরাম ঘোষণা করে সারবান 'পাতা' অর্থাৎ পাত্র যার মধ্যে দেবী কালী বা বিষহরি ভর

করেন। তার যুক্তি– *"পাতা নাহইলে ই চ্যাংড়া খেরা থানে আইসে আছাড় খায়া পইড়বে ক্যান্?''* [৩৬]

সারবান হয়ে যায় দেবাংশী। বিরাম পঁচিশ টাকা দিয়ে তাকে কিনে নেয় দৈত্যারির কাছ থেকে। কেননা– *"তুকতাক্, ওষুধপত্তরে তার নিজেরই খ্যাতি ছিল। এখন দেবাংশী সারবানের অলৌকিক সহায়তায় তার অর্থ রোজগার অনেক বেড়ে গেল।''* [৩৭]

এখানেই প্রমাণিত সারবানের এই অলৌকিকতা সম্পূর্ণ ভুয়ো, যা জানে এর আবিস্কর্তাও। কিন্তু *"মানুষের তো দুঃখের অন্ত নেই।''* [৩৮] আর এই অন্তহীন দুঃখের সমাধান মানুষ চায় অলৌকিকতার কাছে। তাই দেবাংশীর শরণাপন্ন হয় তারা। সারবার কখনও নিদান দেয়, কখনও থানের একমুঠো মাটি তুলে দেয় আগমনকারীর হাতে। দশটা নিদানের মধ্যে আটটাই বিফল হয় কখনও কখনও। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস হারায় না। কেননা এই সবহারানো প্রান্তিক মানুষের কাছে এই বিশ্বাসই একমাত্র আশ্রয়, কেননা সর্বশক্তিময় ঈশ্বর এই আদালতের বিচারকর্তা। তাই *"যা ফলে না তাতে মানুষ মানতকারীর ত্রুটি ঠিক খুঁজে বার করে।''* [৩৯] ধীরে ধীরে সারবানের নিজেরও ধারণা হয় যে দেবাংশী। এই ধারণা জন্মানোর পেছনে দুটো কারণ উপস্থাপিত করেছেন লেখক অভিজিৎ সেন। এই দুটো কারণ সারবানের দুটো অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্হিপ্রকাশ।

১। *"না হলে, এত মানুষ কারণে অকারণে তার কাছে আসবে কেন?''* [৪০]

২। *"কারণ দেবাংশী হয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় তার হাতে ছিল না। তার মা ও বাপের মৃত্যু এবং তৎসংযুক্ত কারণসমূহ তাকে একজন দুঃখী মানুষই করে রাখে চিরকাল। কাজেই হাজার হাজার মানুষের আর্তি শোনার জন্য সে একসময় দেবাংশী হয়ে থাকাই স্থির ক'রে নেয়।''* [৪১]

এমনই অন্তর্দ্বন্দ্ব আমরা দেখেছিলাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম গল্প 'দেবী'তে দয়াময়ীর মধ্যে। পুত্রবধূ দয়াময়ীর মাঝে মা কালীর রূপ স্বপ্নে দেখে শ্বশুর কালীকিঙ্কর রায় যখন পুত্রবধূকে দেবী আসনে বসিয়ে তার পূজা শুরু করলেন ও

চারিদিকে তার দেবীমাহাত্ম প্রচারে উদ্‌গ্রীব হলেন তখন এ সমস্ত থেকে যে কোনোভাবে বেরিয়ে আসতে চাওয়া দয়াময়ীও গল্পের শেষের দিকে এসে স্বামীর সাথে পালিয়ে আসতে দ্বিধা বোধ করে। কেননা তার মনে হয়েছে হয়তো তার মধ্যে দৈবীগুণ সত্যই বিদ্যমান। তাই সে বলতে পেরেছে–

"আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।'' [৪২]

এই আত্মদ্বন্দ্ব রয়েছে সারবানের মধ্যেও। এই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কেননা সে সামাজিক পরিমণ্ডলে তার অবস্থিতি– *".....সেখানে প্রায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকেই দৈবসৃষ্ট মনে করা হয়। এমনকি যে সামান্য বিষয়গুলোর সঙ্গে কোনোক্রমেই আকাশসম্ভূত প্রতিবন্ধকতার কোন সম্পর্ক কেউ কল্পনাও করবে না, এখানে সে সবেরও প্রতিবিধান করার চেষ্টার অন্যতম আধিদৈবিক পদ্ধতি। সেই কারণেই সারবান দেবাংশী।''* [৪৩]

এই আধিদৈবিকতা, এই অলৌকিকতার শেকড় এতটাই বিস্তৃত যে তা সংস্কার বা বিশ্বাসের মাত্রা ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে বাস্তব। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বাস্তব জীবন এই আধিবাস্তবকে স্বীকার করে, তাকে সঙ্গে নিয়ে, তাকে আকঁড়ে ধরেই গড়ে ওঠে। লেখক অভিজিৎ জানাচ্ছেন–

"লৌকিক-অলৌকিকের মধ্যে সীমারেখা এই পরিমণ্ডলে খুবই ক্ষীণ, কখনো সেটুকুও থাকে না।'' [৪৪]

তাই তারা বিশ্বাস করে দেবাংশীর কথা দৈববাণী। তার নিদান কখনই বিফল হতে পারে না। ভর হওয়া দেবাংশীর তুলে দেওয়া কালী কিংবা মনসা থানের এক চিমটা মাটির মহিমা বিপুল।

"যক্ষ্মা, হাঁপানি, কুষ্টর মতো রোগও সেই মাটি ধোওয়া জল খেলে সেরে যাবে।

বন্ধ্যা রমণী সন্তানবতী হবে, পঙ্গু নিজের পায়ে হাঁটবে, অন্ধ এই পৃথিবীর আলো, বৃক্ষলতা সব দেখবে। বুজে যাওয়া পুষ্করিনীর জলে মাছে কেলি করবে, বাঁজা গাই রাত দুপুরে ডাক তুলবে পাড়া কাঁপিয়ে, যে গাইয়ের বাছুর ঘরে দুধের অভাবে, তার মরা ওলানে দুধের বান ডাকবে। সাপ, বিছা, ভূত-প্রেত, মাদার আর জিনের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে কোলের শিশু পোয়াতি স্ত্রীলোক। মায় যে সব লাউ কুমড়ো সিম ঝাঁকায় কেবল জালি আসে আর ঝরে মরে যায় সে সব গাছও ফলভারে ঝাঁকা ভেঙে ফেলতে চাইবে।'' [৪৫]

এই অলৌকিক বিশ্বাস কী কেবলমাত্র অন্ধবিশ্বাস, না একটি পিছিয়ে পড়া, শোষিত জাতির বেঁচে থাকার একমাত্র অন্যতম আশ্রয়ও। যারা অর্থের জোরে, শক্তির জোরে দীর্ঘকাল ধরে দমিয়ে রেখেছে এই খেটে খাওয়া গোষ্ঠীকে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিরোধ সম্ভব নয় কারণ তাদের জমি জোতদারের কাছে বাঁধা দেয়া, তাদের নিজের জমি নেই, বলদ নেই, অর্থ নেই, তাই প্রতিরোধের ভাষাও নেই। তাই তাদের একমাত্র আশ্রয় অলৌকিক শক্তি। এই শক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক আত্মিক। তাই তাদের সমস্ত সমস্যারই উপস্থাপনা দেবাংশীর কাছে। সেতু বর্মনের জমি দৈত্যারি মণ্ডল হাতিয়ে নিতে চাইছে– এর সমাধানও সেতু চেয়েছে সারবান দেবাংশীর কাছে। এতে সারবান আশ্চর্য হয়েছে, অসহায় বোধ করেছে নিজেকে। তার মনে হয়েছে–

"সমস্যাগুলো কিছু নতুন নয়, কিন্তু মানুষ দেবাংশীর কাছে এই ধরণের অভিযোগ আনতে শুরু করেছে, এটাই নতুন। মানুষ এইসব সমস্যার সমাধান তাদের দেবাংশীর কাছে চায়, এটাই নতুন।'' [৪৬]

'নতুন' কেননা এতকাল তারা কেবল বন্ধ্যাত্ব, অসুখ, দুঃখ, যন্ত্রণার কথাই নিবেদন করেছে দেবাংশীর কাছে। জোতদারের অত্যাচার, জবরদখল মেনে নিয়েছে নিরবে। কিন্তু আজ তাদের সহ্যের সীমা ভেঙে গেছে। তাই দেবাংশীর কাছে আর্জি নিয়ে এসেছে সেতু। দেবাংশীর মাঝে তখন বিষহরির ভর। তাই সে দৈববাণী করেছে–

"জমিনের দখল ছাড়বু নাই সেতু। মণ্ডল উচ্ছেদ করব চালে, মাও বিষহরির নামেৎ বাঁধা দিবু। আর এই নি'মায়ের থানের মাটি।" [৪৭]

এই দৈববাণীর পেছনে রয়েছে দেবাংশীর কর্তৃস্থানীয় অবস্থানে বিরাজ করার দায়িত্ব। একটি প্রান্তিকায়িত জাতির অবলম্বন সে। এবং সর্বোপরি সে নিজেও শোষিত। যে দৈত্যারি মণ্ডলের নালিশ নিয়ে সেতু এসেছে তার পিতার কাছ থেকেই সারবান পেয়েছে বাঁধা চাকর হয়ে থাকার গ্লানি। তাই যে কথা সারবান সেতুকে বলেছে তা হয়তো সে নিজেই একই স্থানে অবস্থিত বলেই তার দ্বারা বলা সম্ভব হয়েছে। এই দৈববাণী যেমন সেতুকে শক্তি জুগিয়েছে, তেমনি দৈত্যারীর মনে ভীতির সঞ্চারও করেছে। কেননা দৈত্যারী জানে–

"মানুষের মেজাজ যা হয়েছে, তাতে আগেকার দিনের পদ্ধতিতে আর কাজ হয় না ভালো। একটা গরুচোর ধরা পড়লে বিচারের জন্য অপেক্ষা করে না মানুষ। নিঃশব্দে উবে যায় মানুষটা। ডাকাত ধরা পড়লে প্রত্যেকটি মানুষ একট ক'রে কোপ মারে নিয়ম ক'রে। জমি বেদখল, মেয়ে মানুষ নিয়ে হুজ্জতি, ইত্যাদিতে সহজে পার পাওয়া যাচ্ছেনা। মানুষ এখন আইন দেখায়, যুক্তি দেখায়। কাজেই পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনতে হয়, মাথা খাটাতে হয়। যদিও দৈত্যারী জানে আসল জোর হলো মামলা আর হুজ্জতির জোর, তবুও মাঝে একটু প্রলেপ চাই। কথার প্রলেপ, সামাজিক বিচারের প্রলেপ, এমন কি ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসন, এইসব।" [৪৮]

তাই দৈত্যারী সারবানকে তার বাড়িতে ডেকে এনে প্রথমে ভুলিয়ে ভালিয়ে, তারপর রক্তচক্ষু দেখিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য আদেশ দেয়। কিন্তু দেবাংশী তার সিদ্ধান্ত বদলায় না। কেননা তার কাঁধে এখন একটা গোটা জাতির দায়। মানুষ তাকে একটা আসন দিয়েছে। দৈত্যারী তাকে সেই কর্তৃত্বের আসন থেকে টেনে নামাতে চাইছে যেখানে তার ভূমিকা একজন রক্ষকের, একজন প্রতিপালকের। তাই সে এর বিরোধিতা করেছে। একদিন যার বাপের বাঁধা রাখালি করেছিল তাকেই সে বলতে পেরেছে–

"মণ্ডল, তুমার দেহের যে পুষ্টি, তাৎ বহু মানুষের ঠকানো সম্পত্তির অন্ন আছে। এমন কি এই সারবান লোহারের পাঁচবিঘা সম্পত্তিও তুমার গভ্ভে আছে। কি নাই? চুরি করি যে মানুষ পার পায়, তার বড়ো হংকার– কি, মোর পারা বুদ্ধিমান আর কেও নাই। তুমার হচ্ছে তাই। নিজে তুমি চোর, তাই এতবড়ো কথাডা মোক্ আইজ কবার পারলেন, লয়।'' [৪৯]

এই কথাগুলি দেবতার ভর হওয়ার পর দেবাংশী সারবানের মুখ থেকে বেরোনো তথাকথিত দৈববানী যদিও নয়, কিন্তু এই কথাগুলি এক শোষিত জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কণ্ঠে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের হুঙ্কার। পরমুহূর্তেই দৈত্যারির বাড়িতেই দেবাংশীর ভর আসে আর সেই ঘটনার ছ-সাত দিন পর দৈত্যারি সর্পদংশনে মারা যায়। এই ঘটনার পর সারবানের দেবাংশী রূপ আরো প্রবল হয়ে ওঠে। আর এভাবেই যেন আধিদৈবিকতা আর বাস্তব সমস্যা একাকার হয়ে যায়।

আরেকটি ঘটনাও সারবানের দেবাংশী মহিমা বিস্তারে আরও সাহায্য করে ঃ জোতদার রোহিনী ঘোষাল তার এক আধিচাষি সনাতনকে দিয়ে জাফর নামের আরেক আধিচাষীর বিরুদ্ধে নালিশ জানায় কোর্টে। দরিদ্র জাফর তার এই সমস্যার নিদান যখন দেবাংশীর কাছে চায়, তখন সারবান শঙ্কিত হয়। কেননা যে তার মানবসত্ত্বার অস্তিত্বের সত্যকেই বিশ্বাস করে। সে একজন সাধারণ মানুষের পরিচয়েই বাঁচতে চায়। কিন্তু একথাও জানে তার ওপর লোকের বিশ্বাস এত প্রবল যে তা হবার নয়। তাই জাফরের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা তাকে করতেই হয়। সারবান জাফরকে দিয়ে রোহিনীকে ডেকে পাঠায়। এ সংবাদ পৌঁছানো মাত্র রোহিনী ও তার স্ত্রী দেবাংশীর পায়ে এসে পড়ে এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। দৈত্যারী ও রোহিনীর এই ঘটনাদুটিতে সারবানের মধ্যে একটি জটিল প্রতিক্রিয়া জন্মায়।

"দৈত্যারির মৃত্যুতে দেবাংশী সারবান অসহায় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু রোহিনী জাফর নিষ্পত্তিতে সে ভয় পায়। সে যেন বুঝতে শুরু করে এভাবে চিরকাল চলবেনা।

বিষহরির শক্তি আর দেবাংশীর শক্তি এক নয়। সে এও বোঝে যে মানুষকে একথা বুঝতে হবে।'' [৫০]

গভীর রাতে সে তার স্ত্রীকেও একথা জানায়। কিন্তু তার স্ত্রী সে কথায় আতঙ্কিত হয়।

"বউ তার মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, অংকা কথা কবেন না দেবোংশী, ওলা শুনাও পাপ! হায়্ মাও–'' [৫১]

এই মুখে হাত চাপা দেওয়াটা প্রতীকী। সারবানের স্ত্রী সেই সমস্ত অসহায় মানুষের প্রতিনিধি হয়ে একথা বলছে যাদের সহায় সম্বলহীন জীর্ণ অত্যাচারিত জীবনের একমাত্র আশ্রয় দেবাংশী। এই দেবাংশীর অলৌকিক ক্ষমতাই তাদের শেষ শক্তি। এই আশ্রয়, এই শক্তিকে কিছুতেই তারা হারাতে চায় না। তাদের কাছে সমস্ত বাস্তবতা, সমস্ত প্রতিকূলতা নিয়তি তাড়িত, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা বিধাতাসৃষ্ট। তাই আধিদৈবিক পদ্ধতিতেই তারা তাদের মোকাবিলা করতে চায়। আর এর বিপরীতে রয়েছে শোষক সমাজের প্রতিনিধি বর্গ, যাদের নাম বা উপাধি বদলাচ্ছে, কিন্তু চরিত্রগত পার্থক্য তেমন থাকছে না। তাই রঘুনাথ, দৈত্যারি, বিনোদ সকলেই একই মেরুতে অবস্থান করছে যাদের অন্যতম উদ্দেশ্য শোষণ, উৎপীড়ন– যাদের শিকার সাধারণ গ্রামবাসী, পীড়িত প্রান্তিকায়িত জনগণ।

শহুরে জীবনের ভোগবিলাসে অভ্যস্ত দৈত্যারির পুত্র বিনোদ গ্রামে এসে তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির মানসিকতা চরিতার্থতার জন্য যথেচ্ছাচার শুরু করে। সেতুর সঙ্গে যে বিরোধের একদা নিষ্পত্তি ঘটেছিল দৈত্যারির অপমৃত্যুতে, সেই পুরোনো বিরোধই জাগিয়ে তুলতে চায় বিনোদ। সেতুর সাথে বিরোধ পুনরায় জাগিয়ে তোলার আরেকটি প্রধান কারণ হলো সেতুর বিবাহিতা কন্যা বারুণী। অর্থ ও নারী দুই বিলাসেই মগ্ন বিনোদের কাছে তাই মনে হয়–

"ঐ চোয়াড়ে চেহারার মানুষটা, যার নাম নাকি বিহানু, হলুদ রঙের হাফশার্ট আর

আটহাতি কোরা ধুতি পরে বারুণীবালার মতো মেয়েকে পাশে নিয়ে শ্বশুড়বাড়িতে ঢোকে, বিনোদের কাছে এ অতি বড়ো অমর্যাদার এবং অবিচার মনে হয়। এ যেন সেই অধিকারে বে-আইনী হস্তক্ষেপ, যে অধিকারের নিজস্ব নিয়মে হাজার জনের মধ্যে একজন যাবতীয় ভালো জিনিসগুলোর মালিক।'' [৫২]

এই একজন হলো শোষক সমাজের প্রতিনিধি, যার নাম কখনো 'দেবাংশী' গল্পে বিনোদ বা দৈত্যারী বা রঘুনাথ, কখনো 'রহুচণ্ডালের হাড়' এ দারোগা ভগত। তাই বালি বাজিকর বলেছিল এ জগতের মাঠে চরা সমস্ত জানোয়ার যদি বাজিকরদের হয় তাহলেও–

"কিন্তু তার মধ্যের ভালোটা দারোগার।'' [৫৩]

যাইহোক, এই অলিখিত অবশ্য প্রাপ্যের নেশায়ই বিনোদ বারুণীকে ধরে নিয়ে যায়, তাকে ধর্ষণ করে, তার বাপের মুখ বন্ধ করে দেয় ঋণের বোঝা চাপিয়ে, লোকলজ্জার ভয় চাপিয়ে। এরকমই হয়ে আসছে চিরকাল ধরে– শোষকের পাপের দায় বয়ে বেড়িয়েছে আক্রান্ত। কানাঘুষো চলছে বারুণীর চরিত্র নিয়ে। বারুণী নিশ্চুপ। অপেক্ষা করে আছে শ্রাবণ সংক্রান্তির। যেদিন সে তার সমস্ত ক্ষত উন্মোচন করবে দেবাংশীর দরবারে। দেবাংশী এর বিচার করবেন। ধ্বংস হয়ে যাবে বিনোদও তার পিতা দৈত্যারীর মত। কিন্তু অন্যদিকে সারবানের দৈবী মাহাত্ম্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সারবান তত ব্যাকুল ভাবে তা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। মা বিষহরির কাছেও সে মুক্তি প্রার্থনা করেছে। তার এই আত্মকাঙ্খা, আত্মপোলব্ধিকে সর্বজন সমক্ষে উন্মোচন করার জন্য সে বেছে নিয়েছে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনটিকেই। 'দেবাংশী' গল্পে এই কৌম সমাজের উৎসবের একটি অত্যন্ত জীবন্ত বর্ণণা রয়েছে। লোক-উৎসব সংক্রান্ত 'কার্নিভাল' তত্ত্বে বাখতিন বলেছিলেন –

"that the carnival is the place for working out, in a concretely sensuous, half-real and half-play acted form, a

new mode of interrelationship between inviduals, counter posed to the all powerful socio hierarchical legitimized by carnival permits the latent sides of human nature to reveal and express themselves (1984, 123), a suggestion that obviously has a bearing upon his interest in Dostoersky's use of eccentrics in his FICTION." [৫৪]

অর্থাৎ কার্নিভাল হলো এক বিশেষ উৎসব, যা আদিম কৌম সমাজে অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসবের মধ্যেই প্রকাশিত হয় শোষক সমাজের বিরুদ্ধে এ যাবৎ চাপা ক্ষোভ। তাই সংক্রান্তির দিনেই বিদ্ধস্ত বারুণী উপস্থিত হয় দেবাংশীর সামনে। চায় তার উপর হওয়া অত্যাচারের বিচার। কিন্তু সারবান আর দেবাংশী হয়ে থাকতে চায় না। সে জানে আজ পর্যন্ত যে সকল নিদান সে দিয়েছে, যে সমস্ত বিচার সে করেছে তা আর যাই হোক অলৌকিক শক্তির বশবর্তী হয়ে নয়, বরং শোষিতের একজন হয়ে তাদের স্বার্থেই সে কিছু প্রয়াস করেছে। কিন্তু সে ভীষণভাবেই জানে যে এই প্রক্রিয়া চিরকালীন নয়। তাই সে ঘোষণা করে–

"আমি দেবাংশী লয় মাও, আমি একজনা সাধারণ মানুষ।.... মঁয় সত্যই দেবোংশী লই। মঁয় সারবান লোহার বাপের নাম হীরামন লোহার, তোমাহরের আর দশজনার মতো একজন সাধারণ মানুষ। মঁয় কি বিচার করবা পারি?'' [৫৫]

কিন্তু বারুণী সে কথা জানতে চায় না, কেননা তার একমাত্র অবলম্বন ছিল দেবাংশী, তার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন দেবাংশীর কাছে নিবেদন করলে সব অন্যায়ের প্রতিকার হবে। সুতরাং সে আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় কাতর, অবিশ্বাসের যন্ত্রণায় অস্থির–

"দেবোংশী, দশদিন, বারোদিন মঁয় চুপ কইরে আছি। বাপ মাওয়ের কথার জবাব দিঁই নাই, পাড়া-পড়শীর সঙ্গে কথা কই নাই, ঘরে ভিতরে নুক্‌কে আছি, কেও যেন

মোর মুখের দিকে তাকাবা না পারে। দশজনার কাছেৎ দশকথা শুনে আজ মোর স্বামী আসিছে। আমার কাছেৎ জানবা চায় সে। কী কমো মঁয় তাক্? ক'লে কি সে মোক্ ঘরে নিবে?..... আশায় থাকিছি, দেবোংশী আছে। আশায় এ্যাটা এ্যাট্টা কইরে দিন গনিছি, কবে শাঙন সংক্রান্তি আসবে, কবে খেরার থানে দেবোংশী বইসবে! কেনকি, আমি তো জানতোঁ মো কথা কারুকে বুঝাবার লয়, কারুকে বলার লয়। জানতোঁ মোর বিচার করতে পারে খালি দেবোংশী। আর আইজ, আইজ, তুমু ক'ছেন তুমু বিচার করবা পারবেন না তবে মোয় কুনঠি যামো, কার কাছেৎ বিচার চামো? কে করবে মো সমিস্যা সুরাহা?'' [৫৬]

আর তখনই আসে সেই চরম মুহূর্ত যখন সারবান দেবাংশী সত্তা থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত অলৌকিক সংস্কারের ভার খসিয়ে দিয়ে, প্রতিভাত হয় একটি শোষিত সমাজের নেতা হিসেবে। গ্রহণ করে এক গভীর প্রত্যয়যুক্ত দায়িত্ব। বারুণীকে চিনিয়ে দিতে বলে তার ওপর আক্রমণকারীদের। উপস্থিত জনগণের মধ্যে মজা দেখতে আসা বিনোদকে যখন অত্যাচারী হিসেবে চিনিয়ে দেয় বারুণী। তখন একজন প্রকৃত নেতা হিসেবে সারবান লোহার (দেবাংশী নয়) প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে উত্তাল হওয়ার জন্য শোষিত সমাজকে উৎসাহিত করে। সে তাদের সামনে সেই অমোঘ সত্যটি স্পষ্ট করে যে তাদের উপর এতদিন ধরে চলতে থাকা শোষণ কোনো একজন দেবাংশী বন্ধ করতে পারবে না। এই শোষণ, এই প্রান্তিকায়ন রোধ করতে সকলকে সংঘবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। বারুণীর সাথে হওয়া ঘটনা কেবল বারুণী, তার স্বামী বিহানু বা তার পিতা সেতুর সমস্যা নয়। এই ঘটনা যে কোন কারও কন্যা, বোন বা স্ত্রীর সাথে ঘটা সম্ভব। তাই সারবান সকল পিতা, সকল ভাই, সকল স্বামীদের এগিয়ে আসতে বলে, বলে সংঘবদ্ধ হতে, বলে একজোট হয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে। সকলে সারবানের এই আহ্বানে সাড়া দেয়। এমনই একটি ইতিবাচকতার ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন দেবাংশী বড়গল্পটির উপসংহারে –

"হঠাৎ সমস্ত মানুষ একযোগে বিনোদ এবং তার সঙ্গীর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সারবান এগিয়ে আসে বিনোদের সামনে। বলে, মানুষ দুইটা মহাপাপী। তুমরা যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, সোয়ামী আছেন, আপন আপন বেটির, বুনের, ইস্তিরির ইজ্জৎ বাঁচাবার দায় তুমাহোরের সব্বার। তুমরা যদি সব্বাই চানই পাপ বন্দ হউক, তবে ই পাপ বন্দ হবে। ই দায় দেবোংশীর একার লয়।

বিনোদ এবং তার সঙ্গী আতঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করে। চারদিকে থিকথিকে ভিড় ঘন হয়ে আসছে। সবার উপরে সারবানের ঋজু দেহ খেরা থানের গণ্ডির বাইরে। বিনোদ পিছিয়ে আসতে আসতে গণ্ডির ভেতরে ঢুকে পড়ে।" [৫৭]

'গণ্ডির ভেতরে ঢুকে পড়া' আসলে শোষকের আত্মসমর্পণের প্রতীকায়ন। একদিন এই গণ্ডির ভেতরে ঢুকিয়েই অসহায় সারবানকে দেবাংশী প্রমাণ করেছিল বিরাম গুণমান। কিন্তু আজ সারবান একজন মানুষের পরিচয় নিয়ে এই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। এভাবেই লোকবিশ্বাসের বিনির্মাণ ঘটেছে অভিজিৎ সেনের হাতে। লেখক প্রসুন ঘোষ যথার্থই বলেছেন–

"লৌকিক ও অতিলৌকিক জগতের বেড়াজালকে ভেঙে কৌম সমাজের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভেদরেখাটি মুছে ফেলে রাজনীতি, সমাজনীতির মাত্রাকে সংযুক্ত করে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটান লেখক। 'দেবাংশী' গল্পে সংস্কারের নির্মোক খসে ধ্বস্ত সমাজে মানবিকতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে সারবান।" [৫৮]

আর এভাবেই লাতিন আমেরিকার লেখকদের সাথে আমাদের বাংলাসাহিত্যের বর্তমান সময়ের তথাকথিত মূলস্রোত থেকে সরে আসা লেখকের ঐকান্তিকতা ঘটে যায়। লৌকিক এবং অলৌকিক জগৎ একাকার হয়ে গিয়ে একটি নতুন জগৎ নির্মাণ হয়ে যেখানে কোন বিষয়ই আধুনিক উপন্যাসের উপাদান হতে না পারার মত নয়। আধুনিক উপন্যাসের এই ধারায় Magic এবং Reality উভয়েই অবস্থান রয়েছে কারণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই উভয় বিষয়ের সংস্পর্শের বাস্তব সমাজের যথার্থ রূপায়ণ,

আধুনিক উপন্যাসের যথার্থ চিত্রায়ণ সম্ভব। এই বিষয়ই মাথায় রেখেই সম্ভবত লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে magic realism এর যাত্রা শুরু হয়েছিল–

"The term magic realism originally applied inthe 1920s to a school of painters, is used to describe the prose fiction of Jorge Luis Borges in Argentina, as well as the works of writers such as Gobrial Garcia Marquez in Colombia, Guntor Gress in Germany, and John Fowles in England, these writers interweave, in an ever shifting pattern, a sharply etched realism in representing ordinary events and descriptive details together with fantastic and dreamlike elements, as well as with materials derived from myth and fairy tales. Robert scholes has popularized metafiction as a overall term for the large and growing class of novels which depart drastically from the traditional categories eighter of realism or romaticism and also the term fabulation for the current mode of free wheeling narrative invention. These novels violate, in various ways, standard novelistic expectations by drastic and sometimes, highly effective- experiments with subject matter, form, style, termporal sequences and fusions of the everyday- the fantastic, the mythical and the nightmarish, in renderings between what is serious or trival, horrible or ludicrous, tragic or comic." [৫৯]

এই পথেই হেঁটেছেন আমাদের লেখক অভিজিৎ সেন। তাই তার রচনায় মনসামঙ্গলের পুরাকথা, 'রহু চণ্ডালের মিথ, দেবাংশীর ওপর বিশ্বাস সমস্তই জায়গা পেয়েছে। জায়গা পেয়েছে, নতুন রূপে, নানা ভাঙাগড়ার ভেতরে দিয়ে। এই বিনির্মাণ এর মধ্য দিয়ে হেঁটেই লেখক অনুসন্ধান দিয়েছেন বাংলা আধুনিক উপন্যাসের সেই পথের যার কথা আমরা বাংলা সাহিত্যে এতদিন কিছু কিছু পেয়েছি, একটা 'প্যারালাল' ধারা হিসেবে তবে মূলস্রোত হিসেবে নয়। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু-দের কবিতায় myth এর deconstruction পেয়েছি। পেয়েছি সাধন চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়ও। উদাহরণ, 'তাঁর 'জলতিমির' এ কৃষ্ণ, কালীয়দমন ইত্যাদি পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে বর্তমান বাস্তবের আর্সেনিক সমস্যাকে তুলে ধরার প্রেক্ষিতে। বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাট্যে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে। ধরায় বর্ষণ হওয়ার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করতে তরঙ্গিনীর দীর্ঘপ্রয়াস, ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যভঙ্গ, ঋষি কর্তৃক তরঙ্গিনী পরিত্যাগ– ঘটনাগুলির যথার্থ পৌরাণিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও পুরাকথার এই নবনির্মাণে যে লেখক সার্থক তা অবশ্যস্বীকার্য। মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র প্রমুখের রচনায়ও পুরাণ ও মিথের বিনির্মাণ, নবনির্মাণ হয়েছে নানাভাবে। ভগীরথ মিশ্রের 'মৃগয়া' উপন্যাসের পরিক্ষিত চরিত্র নির্মাণ যার সার্থক প্রমাণ। লেখক 'মহাভারত' এর পৌরাণিক কাহিনিকে গ্রহণ করে এর মাঝে আপন চিন্তা চেতনার স্ফূরণ ঘটিয়ে দেখাতে চাইলেন যে কুরু-পাণ্ডবের লড়াই আসলে জমির লড়াই। অমর মিত্রের 'অশ্বচরিত' এও বুদ্ধদেবের কাহিনি উঠে আসে আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান হয়ে। দিঘার হোটেলের শ্রীমন্তের মালিকের কাছে ঘোড়া প্রতিভাত হয় গৌতম বুদ্ধের ঘোড়া রূপে, যে ঘোড়ায় চড়ে গয়ায় গিয়ে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। এই কাহিনির গ্রন্থনায় পাশাপাশি উঠে আসছে রোম বেবিলন যুদ্ধের বর্ণনাও। এসেছে সেই ক্ষেতের প্রসঙ্গ যেখানে প্রস্তুত হচ্ছে পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্র কিংবা রকেট উৎক্ষেপন কেন্দ্র, আর এই প্রক্রিয়ায় পুরাণ ইতিহাস বাস্তব সব একাকার হয়ে যাচ্ছে যা বাংলা উপন্যাসের

মূলধারায় এতকাল কল্পনাই করা যায় নি। তাই হয়তো বলা হচ্ছে–

"These novels violate, in various ways, standard novelistic expectations by drastic- and sometimes highly effective - experiments with subject matter, form, style, temporal sequences...." [৬০]

এই পথের আরেক দিশারী লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাই হয়তো 'ঝাঁসী কি রানী'র মত উৎকৃষ্ট রচনা নির্মাণের জন্য বুন্দেলখণ্ডের গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিথ সংগ্রহ করে নির্মাণ করেন নবআখ্যান। সত্তরের দশকের মহান সাহিত্যিকদের তৈরি এই বিকল্প পথ আসলে গন-আন্দোলনের এক নতুন পর্বের সূচনা। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে একধরণের প্রতিবাদী অবস্থান। আধুনিকতা যদি উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের কামপ্রেমের styriotype আখ্যান রচনা হয় তবে Counter discouse of Modernity অত্যন্ত প্রয়োজন। আধিপত্যবাদী বনাম প্রান্তিক জনগণ এর লড়াইয়ে প্রান্তবাসীর ভাষ্য নির্মাণের প্রয়াসী সত্তর পরবর্তী এই লেখকগোষ্ঠী বিকল্প আধুনিকতার কথা বলেন যার ধারাটি পুষ্ট হবে শোষিতদের চোখে যথার্থ বাস্তব পরিদর্শনের মাধ্যমে। তাই এতে লোককথা, মিথ, পুরাণ, যাদু, ধর্মীয় বিশ্বাস– এসব আসবেই। এই পথে এগোতে এই গোষ্ঠী প্রেরণা নিয়েছে মার্কেজ কিংবা গুন্টার গ্রাস, চুনিয়া আচেব প্রমুখের লেখনবিশ্ব থেকে। ফলে magic realism বা যাদুবাস্তবতা হয়ে গেছে এই সাহিত্য ধারার অন্যতম উপকরণ। এই গোটা প্রক্রিয়াটাই আসলে Post colonial movement এর অংশ। তারা বললেন, বাস্তবের আরেকটা চেহারা রয়েছে যা যুক্তির অতীত। যুক্তি অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের ফলও হতে পারে। তাই সত্তর পরবর্তী লেখকদের রচনায় যুক্তির অতীত বিষয়ও আখ্যানে স্থান পেল। একেই হয়তো বলে counter discourse বা প্রতিবাদী ভাষ্য। তাঁদের মতে প্রকৃত আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য হলো ঐতিহ্যের পুণর্নির্মাণ। প্রতিবাদের ভাষ্য রচনার প্রয়োজনে ঘটেছে এই ঐতিহ্যের পুণর্নির্মাণ। 'দেবাংশী', 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর', 'রহু চণ্ডালের হাড়' 'রাজপাট-ধর্মপাট'– এই প্রতিবাদেরই আখ্যান।

*****

উল্লেখপঞ্জি –

১। রায়, দেবেশ ঃ 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ২০০৫, পৃষ্ঠা– ৩২।

২। উদ্ধৃত, 'আখ্যান রচনার অন্য ভূবন', কোরক, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা– ৯।

৩। সেন, অভিজিৎ ঃ 'লোককথা, লোকসঙ্গীত এবং লোকশিল্পের সেই অবাধ শৈলী আমি আত্মস্থ করতে চাই যা দিয়ে পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত সবাইকেই মুগ্ধ, বিস্মিত এবং প্লাবিত করা যায়।'– বজলুল করিম বাহার এর মুখোমুখি অভিজিৎ সেন। ক্রোড় পত্র- নিসর্গ- ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা– ১৮০।

৪। সেন, অভিজিৎ ঃ 'উপন্যাস ভাবনা', ''বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অন্বীক্ষা'', সুবল সামন্ত সম্পাদিত, কলকাতা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা– ৪৮।

৫। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'অভিজিৎ সেন - এর উপন্যাসিক সন্দর্ভ', ''বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অন্বীক্ষা''– সুবল সামন্ত সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা– ৮৫।

৬। সেন, অভিজিৎ ঃ ''বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা– ১।

৭। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'অভিজিৎ সেন - এর উপন্যাসিক সন্দর্ভ', ''বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অন্বীক্ষা''– সুবল সামন্ত সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা– ১০৭।

৮। সেন, অভিজিৎ ঃ ''বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা– ৮৮।

৯। ঐ, পৃষ্ঠা– ৮৯।

১০। ঐ, পৃষ্ঠা– ৯৫।

১১। শাহরিয়ার, শোয়েব ঃ 'অভিজিৎ সেন ঃ এক মহাকাব্যিক কীর্তনিয়া', ক্রোড়পত্র, নিসর্গ ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা– ২০৩।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা– ২০৩।

১৩। সেন অভিজিৎ ঃ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা কেউ কেউ সত্যিই একটা নতুন ধরণ খুঁজছি'– অঞ্জন সেনের সাথে সাক্ষাৎকার, ক্রোড় পত্র- নিসর্গ ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ১৬৮।

১৪। সেন, অভিজিৎ ঃ 'উপন্যাসভাবনা'– ''বাংলা উপন্যাস, বীক্ষা ও অন্বীক্ষা'', সুবল সামন্ত সম্পাদিত, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃষ্ঠা– ৪৮।

১৫। সেন, অভিজিৎ ঃ ''রহু চণ্ডালের হাড়'', জে, এন, চক্রবর্তী এন্ড কোং, ডিসেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা– ১৫।

১৬। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৯।

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা– ৭।

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা– ৭।

১৯। রায়, আলোক ঃ 'আখ্যান রচনার অন্য ভুবন', কোরক, আগস্ট, ২০০৮, পৃষ্ঠা–১১।

২০। সেন, অভিজিৎ ঃ 'প্রাককথন', ''রাজপাট - ধর্মপাট'', দে'জ পাবলিশিং কলকাতা জানুয়ারী, ২০০৮।

২১। সেন, অভিজিৎ ঃ ''রাজপাট - ধর্মপাট'', দে'জ পাবলিশিং কলকাতা জানুয়ারী, ২০০৮, পৃষ্ঠা– ৯।

২২। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৭।

২৩। ঐ, পৃষ্ঠা– ২১।

২৪। ঐ, পৃষ্ঠা– ২১।

২৫। ঐ, পৃষ্ঠা– ২১।

২৬। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৫।

২৭। ঐ, পৃষ্ঠা–১৫।

২৮। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৯।

২৯। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৯।

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা– ২০।

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা– ৪৭।

৩২। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৭।

৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা– ২৯।

৩৪। সেন অভিজিৎ ঃ 'দেবাংশী', ''পঞ্চাশটি গল্প সুবর্ণরেখা'', কলকাতা ২০০০, পৃষ্ঠা–১০৯।

৩৫। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৪।

৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৩।

৩৭। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৬।

৩৮। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৬।

৩৯। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৬।

৪০। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৬।

৪১। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৯।

৪২। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ঃ 'দেবী', 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা– ৫৬।

৪৩। সেন অভিজিৎ ঃ 'দেবাংশী', 'পঞ্চাশটি গল্প' সুবর্ণরেখা, কলকাতা ২০০০, পৃষ্ঠা– ১১৯।

৪৪। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৯।

৪৫। ঐ, পৃষ্ঠা– ১০৯।

৪৬। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৭।

৪৭। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৬।

৪৮। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১৮।

৪৯। ঐ, পৃষ্ঠা– ১২০।

৫০। ঐ, পৃষ্ঠা– ১২৪।

৫১। ঐ, পৃষ্ঠা– ১২৪।

৫২। ঐ, পৃষ্ঠা– ১২৬।

৫৩। সেন, অভিজিৎ ঃ 'রহু চণ্ডালের হাড়', জে. এন. চক্রবর্তী এন্ড কোং, ডিসেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা– ১২।

৫৪। A Glossary of contemporary Literary Theory", Fourth Edition, Teremy Hawthorn, Arnold, 2000, Page 37 , উদ্ধৃতি, প্রসূন ঘোষ, জনপদপ্রয়াস, প্রবন্ধ সাহিত্য– 'অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প একটি বিশ্লেষণ' পৃষ্ঠা– ৬।

৫৫। সেন অভিজিৎ ঃ 'দেবাংশী', "পঞ্চাশটি গল্প সুবর্ণরেখা", কলকাতা ২০০০, পৃষ্ঠা– ১২৯।

৫৬। ঐ, পৃষ্ঠা– ১২৯।

৫৭। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৩০।

৫৮। ঘোষ, প্রসূন ঃ জনপদপ্রয়াস, প্রবন্ধ সাহিত্য– 'অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প একটি বিশ্লেষণ', পৃষ্ঠা– ৬।

৫৯। The wind up Bird Chronicle by Haruki Munakami- Topic one: Magical Realism "Novel"- Abrams, M.H.A. Glossary of Literacy terms. 9th ed. Fort Worth : Harcourt, Brace Jovanovich. 1993, Source Packet Wind up Bird Chronicle. Pdf.

৬০। ঐ ।